সাহিত্যমেলা

বাংলা । সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

<u>প্রস্তাবনা</u>

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

<u>PREAMBLE</u>

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, econnomic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্যমেলা' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্যমেলা' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা যোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্যমেলা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান'। এগারো পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। সংস্কৃতির নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতে-কলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের উপন্যাস 'মাকু'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

সপ্তম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী শুভাপ্রসন্ন। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আমাদের বিশ্বাস এই অংশটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় সুদক্ষিণা ঘোষ

রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

পরামর্শ ও সহযোগিতা

শুভময় সরকার রূপা বিশ্বাস শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরঞ্জীব সরকার মীনাক্ষী চৌধুরী মণিকণা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

শুভাপ্রসন্ন

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা ১

ছন্দে শুধু কান রাখো — অজিত দত্ত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাগলা গণেশ — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ১২

বঙ্গভূমির প্রতি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাতৃভাষা — কেদারনাথ সিং

একুশের কবিতা — আশরাফ সিদ্দিকী

একুশের তাৎপর্য — আবুল ফজল

নানান দেশে নানান ভাষা — রামনিধি গুপ্ত

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা ২৩

আত্মকথা — রামকিঙ্কর বেইজ

আঁকা, লেখা — মৃদুল দাশগুপ্ত

খোকনের প্রথম ছবি — বনফুল

কুতুব মিনারের কথা — সৈয়দ মুজতবা আলি

আজি দখিন দুয়ার খোলা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৪২

- কার দৌড় কদ্দূর — শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
- নোট বই — সুকুমার রায়
- মেঘ-চোর — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৬৩

- দুটি গানের জন্মকথা
- কাজী নজরুলের গান — রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
- আছেন কোথায় স্বর্গপুরে — লালন ফকির

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ৭০

- স্মৃতিচিহ্ন — কামিনী রায়
- চিরদিনের — সুকান্ত ভট্টাচার্য
- জাতের বজ্জাতি — কাজী নজরুল ইসলাম
- তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে — রজনীকান্ত সেন

সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮০

- ভানুসিংহের পত্রাবলি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮৫

ভারততীর্থ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী — কমলা দাশগুপ্ত

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ৯৫

রাস্তায় ক্রিকেট খেলা — মাইকেল অ্যানটনি

দিন ফুরোলে — শঙ্খ ঘোষ

জাদুকাহিনি — অজিত কৃষ্ণ বসু

গাধার কান — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাটিয়ালি গান — ও আমার দরদী আগে জানলে

দশম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৯

পটলবাবু ফিল্মস্টার — সত্যজিৎ রায়

চিন্তাশীল — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাদশ পাঠ

পৃষ্ঠা ১৩৯

দেবতাত্মা হিমালয় — প্রবোধকুমার সান্যাল

বই-টই — প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই পড়ার কায়দা কানুন

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ১৫০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শুভাপ্রসন্ন

ছন্দে শুধু কান রাখো

অজিত দত্ত

মন্দ কথায় মন দিয়ো না
ছন্দে শুধু কান রাখো,
দ্বন্দ্ব ভুলে মন না দিলে
ছন্দ শোনা যায় নাকো।
ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে
ছন্দ আছে জোছনাতে,
দিন দুপুরে পাখির ডাকে
ঝিঁঝির ডাকে ঘোর রাতে।
নদীর স্রোতের ছন্দ যদি
মনের মাঝে শুনতে পাও
দেখবে তখন তেমন ছড়া
কেউ লেখেনি আর কোথাও।
ছন্দ বাজে মোটর চাকায়
ছন্দে চলে রেলগাড়ি
জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে
নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।
ছন্দে চলে ঘড়ির কাঁটা
ছন্দে বাঁধা রাত্রি-দিন,
কান পেতে যা শুনতে পাবে
কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন।
সকল ছন্দ শুনবে যারা
কান পেতে আর মন পেতে
চিনবে তারা ভুবনটাকে
ছন্দ সুরের সংকেতে।
মনের মাঝে জমবে মজা
জীবন হবে পদ্যময়,
কান না দিলে ছন্দে জেনো
পদ্য লেখা সহজ নয়।

১. **অনধিক দুটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১.১ " মন্দ কথায় কান দিয়ো না "— মন্দ কথার প্রতি কবির কীরূপ মনোভাব কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে?

১.২ " কেউ লেখেনি আর কোথাও "— কোন লেখার কথা এখানে বলা হয়েছে?

১.৩ " চিনবে তারা ভুবনটাকে "— কারা কীভাবে ভুবনটাকে চিনবে?

১.৪ " পদ্য লেখা সহজ নয় "— পদ্য লেখা কখন সহজ হবে বলে কবি মনে করেন?

১.৫ " ছন্দ শোনা যায় নাকো " — কখন কবির ভাবনায় আর ছন্দ শোনা যায় না?

২. **বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করো এবং বাক্য রচনা করো :**

ঝড়, মন, ছন্দ, দিন, সুর, সংকেত, দ্বন্দ্ব, মন্দ, ছন্দহীন, পদ্যময়, সহজ,

যেমন— ঝড় (বি.) > ঝোড়ো (বিণ.) > আজ সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

৩. **নীচের শব্দগুলিকে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য লেখো :**

মন্দ, দ্বন্দ্ব, তাল, ডাক, বাজে, ছড়া, মজা, নয়।

শব্দার্থ : দ্বন্দ্ব— সংঘাত, ঝগড়া, বিবাদ। ভুবন— পৃথিবী, জগৎ। সঙ্কেত—ইশারা, ইঙ্গিত।

৪. **নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে লেখো :**

জোছনা, চাকা, কান, দুপুর, ঝিঁঝি।

৫. **কবিতার ভাষা থেকে মৌখিক ভাষায় রূপান্তরিত করো :**

৫.১ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে

৫.২ ছন্দে বাঁধা রাত্রি দিন

৫.৩ কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন

৫.৪ চিনবে তারা ভুবনটাকে/ছন্দ সুরের সংকেতে

৫.৫ কান না দিলে ছন্দে জেনো/পদ্য লেখা সহজ নয়

৬. **'কান' শব্দটিকে পাঁচটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো :**

অজিত দত্ত (১৯০৭ - ১৯৭৯) : জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার একজন বিশিষ্ট কবি। বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তরুণ বয়সেই সম্পাদনা করেন 'প্রগতি' পত্রিকা। 'কল্লোল' সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অজিত দত্ত 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা থেকেই ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস', 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্নবা', 'ছড়ার বই', 'ছায়ার আলপনা' প্রভৃতি।

৭. ‘ঝড়-বাদল’— এমনই সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দ দিয়ে তৈরি পাঁচটি শব্দ লেখো :

৮. তোমার পরিচিত আর কোন কোন যানবাহনের চলার মধ্যে নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে?

৯. নানা প্রাকৃতিক ঘটনায় কীভাবে প্রকৃতির ছন্দ ধরা পড়ে?

কান পেতে শোনা যাবে এমন	মন পেতে শোনা যাবে এমন

- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘পালকির গান’ কবিতাটি শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সংগ্রহ করো।

১০. সমার্থক শব্দ লেখো :

জল, দিন, রাত্রি, নদী, ভুবন

১১. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :

দিন	মন	সুর	সকল
দীন	মণ	শূর	শকল

১২. ‘যারা-তারা’ র মতো তিনটি সাপেক্ষ শব্দজোড় তৈরি করো।

১৩. কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে তিনটি সর্বনাম লেখো।

১৪. কবিতায় রয়েছে এমন চারটি ‘সম্বন্ধ পদ’ উল্লেখ করো।

১৫. নীচের বাক্য/ বাক্যাংশের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদাভাবে দেখাও :

১৫.১ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে

১৫.২ দেখবে তখন তেমন ছড়া / কেউ লেখেনি আর কোথাও।

১৫.৩ জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে / নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।

১৫.৪ চিনবে তারা ভুবনটাকে / ছন্দ সুরের সংকেতে।

১৬. নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

১৬.১ ছন্দে শুধু কান রাখো।

১৬.২ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে।

১৬.৩ দিন দুপুরে পাখির ডাকে।

১৬.৪ ছন্দে চলে রেলগাড়ি।

১৬.৫ চিনবে তারা ভুবনটাকে।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
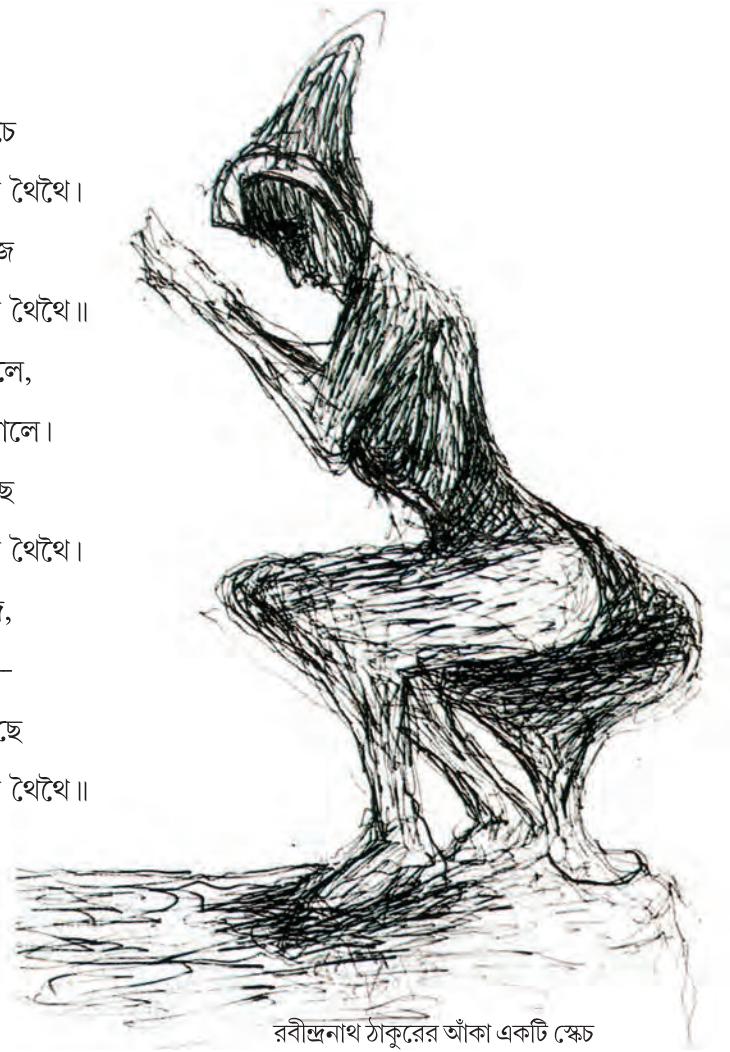
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি স্কেচ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অগ্রগণ্য গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি ‘গীতিবতান’ নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে ‘স্বরবিতান’ নামের বইয়ে। এই গানটি ‘বিচিত্র’ পর্যায়ের অন্তর্গত।

পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমন কি কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ,মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই। মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক-দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর, তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি। সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না! ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়!

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

তার পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হলো এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল, তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হলো।

গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না, তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটা গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখেছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ ! তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

ক দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী ! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ!

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো! বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উল্টে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করেও কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোটো ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে

রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ, সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স পড়াতেন, তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনো প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!

হ্যাঁ। কবিতা পড়ো?

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কিছু বুঝলে?

লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশো একান্ন বছর।

বাচ্চা ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হতো না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটি কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ... কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস... আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ—শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।—

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—

গণেশ হতাশ হলো। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়ো সড়ো পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার!

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দুজনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুই-ই হলো। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনালো, ছবি দেখালো।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না।

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি। বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল। পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল! লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

১. **সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

১.১ ‘পাগলা গণেশ’ একটি (বিজ্ঞান/ কল্পবিজ্ঞান/ রূপকথা) - বিষয়ক গল্প।

১.২ ‘অবজার্ভেটরি’– র বাংলা প্রতিশব্দ (পরীক্ষাগার/ গবেষণাগার/ নিরীক্ষণাগার)।

১.৩ সভ্যসমাজ থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে গণেশ (হিমালয়ের গিরিগুহায়/ গভীর জঙ্গলে/ মহাকাশে) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১.৪ গল্পের তথ্য অনুসারে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়েছিল (৩৫৮৯/ ৩৪৩৯/ ৩৫০০) সালে।

২. **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

২.১ ‘‘সালটা ৩৫৮৯’’— এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা গল্পে বলা হয়েছে ?

২.২ ‘‘ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না’’---‘অনাবশ্যক ভাবাবেগ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? তাকে সত্যিই তোমার ‘অনাবশ্যক’ বলে মনে হয় কি ?

২.৩ ‘‘চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না’’— মানুষের মন থেকে কোন কোন অনুভূতিগুলো হারিয়ে গেছে ?

২.৪ ‘‘ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে’’— ব্যতিক্রমী মানুষটি কে ? কীভাবে তিনি ‘ব্যতিক্রম’ হয়ে উঠেছিলেন ?

২.৫ ‘‘ ও মশাই, এমন বিকট শব্দ করছেন কেন ?’’— কার উদ্দেশ্যে কারা একথা বলেছিল ? কোন কাজকে তারা ‘বিকট শব্দ’ মনে করেছিল ?

২.৬ ‘‘ গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে’’— গণেশ কাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে? তাঁর এই ভুলে যাওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয় ?

২.৭ ‘‘গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল’’— কে, কী বলেছিল ? তার এভাবে তাঁকে সম্মান জানানোর কারণটি কী ?

২.৮ ‘‘ আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি’’— বক্তা কীভাবে পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল ? তার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল কি ?

২.৯ ‘‘লোকটা অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল’’ — এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? সে কী বলল ? তার অসহায়ভাবে মাথা নাড়ার কারণ কী ?

২.১০ ‘‘তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল’’— এই তিনজন কারা ? তাদের মুগ্ধতার কারণ কী ?

৩. ‘পাগলা গণেশ’ গল্পের মুখ্য চরিত্র গণেশকে তোমার কেমন লাগল ?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) : জন্ম ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ময়মনসিংহে। পিতার রেলে চাকরির সূত্রে আশৈশব যাযাবর জীবন দেশের নানা স্থানে। স্কুলশিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস ‘ঘুণপোকা’, প্রথম কিশোর উপন্যাস ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন ১৯৮৫ সালের ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’। এছাড়াও পেয়েছেন ‘আনন্দ পুরুস্কার’, ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার। সব ধরনের খেলায় — বক্সিং, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, টি.টি., অ্যাথলেটিকস-এ তাঁর উৎসাহ অদম্য। পাঠক হিসেবেও সর্বগ্রাসী। ভালোবাসেন থ্রিলার, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি।

৪. অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির পরিবর্তে নতুন শব্দ বসাও :

৪.১ ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।
৪.২ কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না।
৪.৩ দুনিয়াটা বেঁচে যাবে।
৪.৪ মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়।
৪.৫ গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে বলল।
৪.৬ লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে।
৪.৭ হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা, তা নয়।
৪.৮ ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

৫. এককথায় লেখো :

মহান যে সচিব, প্রতিরোধ করে যে, গতিবেগ আছে যার, মৃত্যুকে জয় করেছে যে, অন্ত নেই যার।

শব্দার্থ : প্রতিরোধকারী— প্রতিরোধ করেছে বা বাধা দিয়েছে এমন। উড়ান যন্ত্র— যাতে চড়ে উড়ে বেড়ানো যায় এমন যন্ত্র। সশরীরে— শরীর সহ বা শরীর নিয়ে। অনাবশ্যক — যার দরকার নেই। ভাবাবেগ— আবেগ বা অনুভূতির আধিক্য, বিহ্বলতা। খামোখা—অকারণে, অনর্থক। বিলুপ্ত — সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে এমন। মেদুর—স্নিগ্ধ ও কোমল। উদ্রেক— সঞ্চার, উদয়। মৃত্যুঞ্জয়—মরণকে জয় করেছে এমন। অবজার্ভেটরি— মানমন্দির। গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের গবেষণাগার। ল্যাবরেটরি/গবেষণাগার— (বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে) যেখানে গবেষণা করা হয়। অন্তরীক্ষ — আকাশ। নিপাট—একেবারে, নিতান্ত, নিছক। অন্তহীন— শেষ নেই যার। আয়ু— জীবনকাল। কৃতী— সফল, সার্থক। সসম্ভ্রমে—সম্মান / মর্যাদা সহ। অভিবাদন — নমস্কার বা কোনোভাবে সম্মান প্রদর্শন (দেখানো/জানানো)। নিরীহ— নির্বিরোধ, কারো ক্ষতি করে না এমন। মন্ত্রমুগ্ধ— মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত। উচ্ছন্নে যাওয়া— অধঃপাতে যাওয়া। মকসো—অভ্যাস।

৬. সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, অনাবশ্যক, গবেষণা, অন্তরীক্ষ, গণেশ, হিমালয়, নির্জন গবেষণাগার, পরীক্ষা।

৭. সমার্থক শব্দ লেখো :

কৃত্রিম, পৃথিবী, আন্দোলন।

৮. নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির পর উপযুক্ত বিশেষ্য বসাও এবং বাক্যরচনা করো :

কৃত্রিম, মেদুর, সুকুমার, যান্ত্রিক, ফিরোজা, মন্ত্রমুগ্ধ।

৯. রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

৯.১ গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল।
৯.২ তার গানের গলা বেশ ভালোই।
৯.৩ আকাশে একটা পিপে ভাসছিল।
৯.৪ আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে।
৯.৫ আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।
৯.৬ ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?
৯.৭ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন।
৯.৮ তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

দ্বিতীয় পাঠ

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"My Native Land, Good night!" : Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;—
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো,শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া করো,
ভুল দোষ, গুণ ধরো,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

১. **ঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে লেখো :**

১.১ 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় যে শীর্ষ উল্লেখটি আছে, সেটি কবি বায়রন- এর রচনা। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ________________ ।

১.২ লালবর্ণের পদ্ম 'কোকনদ'। সেরকম নীল রঙের পদ্মকে ________ ও সাদা রঙের পদ্মকে ________ বলা হয়।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ 'এ মিনতি করি পদে'— কবি কার কাছে কী প্রার্থনা জানিয়েছেন?

২.২ 'সেই ধন্য নরকুলে'— কোন মানুষ নরকুলে ধন্য হন?

৩. **গদ্যরূপ লেখো :**

পরমাদ, যাচিব, কহ, যথা, জন্মিলে, দেহ, হেন, সাধিতে

শব্দার্থ : মিনতি— অনুনয়, বিনীত অনুরোধ, আবেদন। পরমাদ —'প্রমাদ'-এর পরিবর্তিত (কোমল) রূপ। ভুল—বিস্মৃতি, অনবধানতা। কোকনদ—লাল পদ্ম। প্রবাস— বিদেশ। দৈব —অদৃষ্ট, ভাগ্য। নীর —জল। শমন— মৃত্যুর দেবতা যম। মক্ষিকা—মাছি। অমৃত—যা পান করলে মৃত্যু হয় না, সুধা। অমৃত হ্রদ--- সুধায় পূর্ণ হ্রদ। জন্মদে---'জন্মদা'-র সম্বোধন রূপ, জন্ম দেয় যে,জননী। সুবরদে—'সুবরদা'-র সম্বোধন রূপ, সু (শুভ) বর দেন যিনি, বরদাত্রী। মধুময়—মধুতে ভরা, মধুমাখা। তামরস— পদ্ম।

৪. **শূন্যস্থানে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :**

.... মন্দির, ...হ্রদ, ...তামরস।

৫. **স্থূলাক্ষর অংশগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৫.১ রেখো, **মা**, দাসেরে মনে।

৫.২ এ **দেহ-আকাশ** হতে।

৫.৩ **মধুহীন** কোরো না গো তব মনঃকোকনদে।

৫.৪ মনের **মন্দিরে** সদা সেবে সর্বজন।

৫.৫ মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে **অমৃত-হ্রদে**!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা প্রখ্যাত আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। বাংলা কাব্যে নতুন যুগ আসে তাঁর কলমে, নাটকেও জাগে নতুন ধারা। হিন্দু কলেজের উজ্জ্বলতম এই ছাত্রটি বিলেতে গিয়ে বড়ো কবি হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে ধর্মান্তরিত হন ১৮৪৩ সালে। তখন থেকে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় 'মাইকেল' শব্দটি। ইংরেজি ভাষায় 'The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করলেও তিনি স্মরণীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা'-র রচয়িতা হিসেবে। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের স্রষ্টা তিনিই। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারও তাঁরই দান।

৬. **পদ পরিবর্তন করে বাক্য রচনা করো :**

মধু, প্রকাশ, দেহ, অমর, দোষ, বসন্ত, দৈব।

৭. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

প্রবাস, অমর, স্থির, জীবন, অমৃত।

৮. 'পরমাদ' শব্দটি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে?

৯. কবির নিজেকে বঙ্গভূমির দাস বলার মধ্যে দিয়ে তাঁর কোন মনোভাবের পরিচয় মেলে?

১০. 'মধুহীন কোরো না গো'—'মধু' শব্দটি কোন দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

১১. কবিতা থেকে পাঁচটি উপমা বা তুলনাবাচক শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১২. 'মন্দির' শব্দটির আদি ও প্রচলিত অর্থ দুটি লেখো।

১৩. কবিতাটিতে কোন কোন ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?

১৪. 'মানস' শব্দটি কবিতায় কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

১৫. কবির দৃষ্টিতে নশ্বর মানুষ কীভাবে অমরতা লাভ করতে পারে তা লেখো।

মাতৃভাষা

কেদারনাথ সিং

পিঁপড়ে যেভাবে ফেরে
নিজের গর্তে
কাঠঠোকরা পাখি
কাঠে ফেরে
বায়ুযান একে একে ফিরে আসে
লাল আকাশে ডানা মেলে
বিমানবন্দরে

ও আমার ভাষা
আমি তোমারই ভিতরে ফিরি
চুপ করে থাকতে থাকতে যখন
আমার জিভ অসাড় হয়ে যায়
আমার আত্মা দুঃখ হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ সিং (১৯৩৪) : হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত কবি। ১৯৮৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ‘আকালের মধ্যে সারস’ (‘আকাল মে সারস’) গ্রন্থের জন্য। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সহজ, দৈনন্দিন ভাষায় কবিতা লেখেন যার মূলে থাকে জটিল জীবনসমস্যার প্রতিফলন।

বিখ্যাত কাব্যসংকলন— ‘আভি বিলকুল আভি’, ‘জমিন পাক রহী হ্যায়’ ইত্যাদি। তিনি গল্প এবং প্রবন্ধ রচয়িতাও বটে।

তরজমা—মল্লিকা সেনগুপ্ত

একুশের কবিতা

আশরাফ সিদ্দিকী

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
কবেকার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রের মতো সেই সুর
সুর নয় স্মৃতির মধুভাণ্ডার...
সেই আমার দেশ-মাঠ-বন-নদী—

আমার দেশের জারি সারি ভাটিয়ালি মুর্শিদি
আরও কত সুরের সাথে মিশে আছে
আমার মায়ের মুখ
আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি!
বিন্নিধানের মাঠের ধারে হঠাৎ কয়েকটি গুলির আওয়াজ...
কয়েকটি পাখির গান শেষ না হতেই তারা ঝরে গেলো
পড়ে গেল মাটিতে
সেই শোকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে
মাঠ কাঁপলো
ঘাট কাঁপলো
বাট কাঁপলো
হাট কাঁপলো
বন কাঁপলো
মন কাঁপলো
ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিলো সব...
তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর
তাই তো আজ দ্যাখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা
যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বড়ো ভালোবাসেন
কথায় কথায় কথকতা কতো রূপকথা
আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান
যিনি এখনো এ মিছিলে গুন গুন করে গাইতে পারেন
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

১. এই কবিতায় কিছু চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কাঁপলো’ এবং ‘দাঁড়িয়েছেন’। প্রসঙ্গত দুটি শব্দই ক্রিয়া। চন্দ্রবিন্দু দিয়ে শুরু এমন পাঁচটি অন্য ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য লেখো।
একটি করে দেওয়া হলো, ‘হাঁটা’।

২. গুনগুন: মৌমাছি যেভাবে ডানার একটানা আওয়াজ করে, তাকে গুনগুন বলে। বাস্তব ধ্বনির অনুকরণে তৈরি হওয়া এই ধরনের শব্দকে বলে অনুকারী বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। নীচে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ শিখে নিতে পারবে।

ক	খ
পাখা	চলছে কল কল করে।
মাছিটা	বাসনগুলো ঝন ঝন করে ভেঙে গেল।
হাওয়া	পড়ল কড় কড় শব্দ করে।
নদী	বন বন করে ঘুরছে।
কাচের	সন সন করে বইছে।
বাজ	পড়ল ধুপ ধাপ করে।
পটকা	ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল।
বৃষ্টি	পড়ছিল ঝর ঝর করে।
কাগজটা	ভন ভন করে উড়ছিলো।
কয়েকটা তাল	ফাটছিল দুম দাম করে।

৩. ‘আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি’— এখানে ‘মায়ের গাওয়া’ শব্দবন্ধটি একটি বিশেষণের কাজ করছে। এরকম আরো অন্তত পাঁচটি তৈরি করো।
একটি করে দেওয়া হলো, ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’

৪. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করে বাক্য রচনা করো :**
সুর, দেশ, মাঠ, বন, মিষ্টি, মুখর, ইতিহাস, ফুল।

৫. ‘রব’ শব্দটিকে একবার বিশেষ্য এবং একবার ক্রিয়া হিসেবে দুটি আলাদা বাক্যে ব্যবহার করে দেখাও।

৬. ‘কলি’, ‘সুর’, ‘পাল’— শব্দগুলিকে দুটি করে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে আলাদা বাক্যে লেখো।

৭. 'মুখ' শব্দটিকে পাঁচটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পাঁচটি আলাদা বাক্য লেখো।

শব্দার্থ : রব— শব্দ, ধ্বনি। জারি— বাংলার মুসলমানি পল্লীসংগীত বিশেষ। পোহাইল— শেষ হলো। সারি— মাঝি-মাল্লাদের গানবিশেষ। কানন— উদ্যান, বাগান। ভাটিয়ালি—মাঝি-মাল্লাদের গান। কুসুমকলি—পুষ্প কলিকা, ফুলের কুঁড়ি। মুর্শিদি— বাস্তব বিষয়ক দেহতত্ত্বের গান। মন্ত্র— পবিত্র শব্দ বা বাক্য। গানের কলি— গানের চরণ বা পদ। কালবৈশাখী— চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালের ঝড়বৃষ্টি। কথকতা—পাঠ বা ব্যাখ্যা। মিছিল— শোভাযাত্রা। রাখাল— গো-রক্ষক, গোরু চরানো ও তত্ত্বাবধান যার কাজ। বিন্নিধান — জমা জলে জন্মানো একপ্রকার আউশধান, এই ধানের খই ভালো হয়। পাঠ— পঠন, অধ্যয়ন, পাঠ্য বিষয়।

৮. **প্রত্যয় নির্ণয় করো :**

কথকতা, মুর্শিদি, মুখর, পোহাইল, ভাটিয়ালি।

৯. **নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ <u>পাখি</u> সব করে রব।
৯.২ <u>কাননে</u> কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
৯.৩ তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ <u>দিগন্ত</u> মুখর।
৯.৪ তিনি বাংলাভাষায় <u>কথা</u> বলতে বড়ো ভালোবাসেন।
৯.৫ <u>রাখাল</u> গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।

১০. **একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১০.১ ''পাখি সব করে রব''— উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন কবিতার অংশ? কবিতাটি তাঁর লেখা কোন বইতে রয়েছে?
১০.২ এই পঙক্তিটি পাঠের সুরকে 'মন্ত্রের মতো ' বলা হয়েছে কেন?
১০.৩ এই সুরকে কেন 'স্মৃতির মধুভাণ্ডার' বলা হয়েছে? তা কবির মনে কোন স্মৃতি জাগিয়ে তোলে?
১০.৪ ''সেই আমার দেশ-মাঠ-বন-নদী''— দুই বঙ্গ মিলিয়ে তিনটি অরণ্য ও পাঁচটি নদীর নাম লেখো।
১০.৫ টীকা লেখো: জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিন্নি ধান, কথকতা, রূপকথা।
১০.৬ তোমার জানা দুটি পৃথক লোকসংগীতের ধারার নাম লেখো।
১০.৭ ''ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিলো সব''— 'সব' বলতে এখানে কী কী বোঝানো হয়েছে?
১০.৮ '' তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর''—'সহস্র পাখি' কাদের বলা হয়েছে?

১১. **ব্যাখ্যা করো :**

১১.১ 'কয়েকটি পাখি...পড়ে গেল মাটিতে'।
১১.২ ' সেই শোকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে।'
১১.৩ ' কথায় কথায় কথকতা কতো রূপকথা'।
১১.৪ 'তাই তো আজ দ্যাখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা।'

১২. আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১২.১ এই কবিতায় ‘পাখি’- শব্দের ব্যবহার কতখানি সার্থক হয়েছে তা কবিতার বিভিন্ন পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।

১২.২ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭) : জন্ম টাঙ্গাইলে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও লেখক এবং খ্যাতনামা লোকতত্ত্ববিদ। পাক্ষিক ‘মুকুল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বিষকন্যা’, ‘উত্তর আকাশের তারা’, ‘কাগজের নৌকা’ প্রভৃতি।

ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদ দিবস : ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা পাবার পর তৎকালীন ভারতবর্ষকে দুটি দেশে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান দেশটাকে গড়া হয় ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশ নিয়ে। যাদের মধ্যে ভৌগোলিক কিংবা ভাষা-সংস্কৃতিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই দেশের মূল শাসনের ভার পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর। ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে চালানোর চেষ্টা চলে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতায় উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। মারা যান আব্দুল সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, সফিউর রহমান, আবদুল বরকত এবং আব্দুল জব্বার। এঁরাই প্রথম ভাষা শহীদ। এঁদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে গণআন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন জনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন সমাপ্ত হয়।

১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেয়।

* পাখি সব করে রব— মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) লিখিত তিনখণ্ডে সমাপ্ত ‘শিশুশিক্ষা’ (প্রথম ভাগ) থেকে গৃহীত। কবিতাটির নাম ‘প্রভাতবর্ণন’।

১৩. “ শুধু মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ নয়, এই কবিতায় রয়েছে আবহমানের ও অমরতার প্রতি বিশ্বাস”— পাঠ্য কবিতাটি অবলম্বনে উপরের উদ্ধৃতিটি আলোচনা করো।

১৪. মনে করো তুমি এমন কোনো জায়গায় দীর্ঘদিনের জন্য যেতে বাধ্য হয়েছো যেখানে কেউ তোমার মাতৃভাষা বোঝেন না। নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার যন্ত্রণা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

১৫. তোমার বিদ্যালয়ে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ কীভাবে পালিত হয়ে থাকে, তা জানিয়ে প্রিয় বন্ধুকে চিঠি লেখো।

একুশের তাৎপর্য

আবুল ফজল

ভাষা কী ও কেন, ভাষা দিয়ে কী হয় ব্যক্তি আর জাতির? ভাষা না হলে আর না থাকলে কী চলে না? এসব প্রশ্নের উত্তরেই নিহিত রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য। ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে—ভাষা ছাড়া মানুষ ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না, পারে না চিন্তা করতে পর্যন্ত। মানুষ একই সঙ্গে প্রকাশ আর বিকাশধর্মী জীব। ভাষা ছাড়া মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশও ভাষাকে অবলম্বন করেই ঘটে। তাই ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে উঠতেই চাই ভাষা। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিজীবনের বিকাশও ঘটে ভাষার সাহায্যেই।

ভাষা ছাড়া জাতিও জাতি হয়ে উঠতে পারে না —বিশেষ একটা ভাষাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সত্তা রূপ পায় ও গড়ে ওঠে। এ বিশেষ ভাষা যে মাতৃভাষা তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ব্যক্তি-জীবন ও জাতীয় জীবন উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য অপরিহার্য। জাতির সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা , সংস্কৃতি সব কিছুরই প্রাণ হচ্ছে তার মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য। তাই মাতৃভাষার ইজ্জত আর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো আপস চলে না। প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে হলেও মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাতৃভাষার দাবি স্বভাবের দাবি, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি। এ দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা প্রাণ দিয়েছিলেন—প্রাণ দিয়ে তাঁরা শুধু আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেই বাঁচাননি, আমাদেরও বাঁচার পথ করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা ও তাঁদের স্মৃতি চিরস্মরণীয়। ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা আমাদের অনন্য গৌরব ও আমাদের গর্ব।

একুশে ফেব্রুয়ারির অশ্রুসিক্ত ইতিহাস প্রতি বছর ফিরে এসে আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সার্থক করতে হলে একুশে ফেব্রুয়ারির এ তাৎপর্য বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে বছরের শুধু এক দিন নয়; সারা বছর ধরেই।

আবুল ফজল (১৯০৩—১৯৮৩) : জন্ম চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক লিখেছেন অনেকগুলি। ‘রেখাচিত্র’ গ্রন্থের জন্য ‘আদমজি পুরস্কার’ লাভ করেন। সম্পাদনা করেছেন ‘শিখা’ পত্রিকা। রচনাংশটি তাঁর ‘একুশ মানে মাথা নত না করা’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

নানান দেশে নানান ভাষা

রামনিধি গুপ্ত

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধরা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) : টপ্পা গানের অন্যতম প্রবর্তক। আখড়াই গানেরও তিনি আদিপুরুষ। তাঁর প্রধান গীতিগ্রন্থ 'গীতরত্ন'।
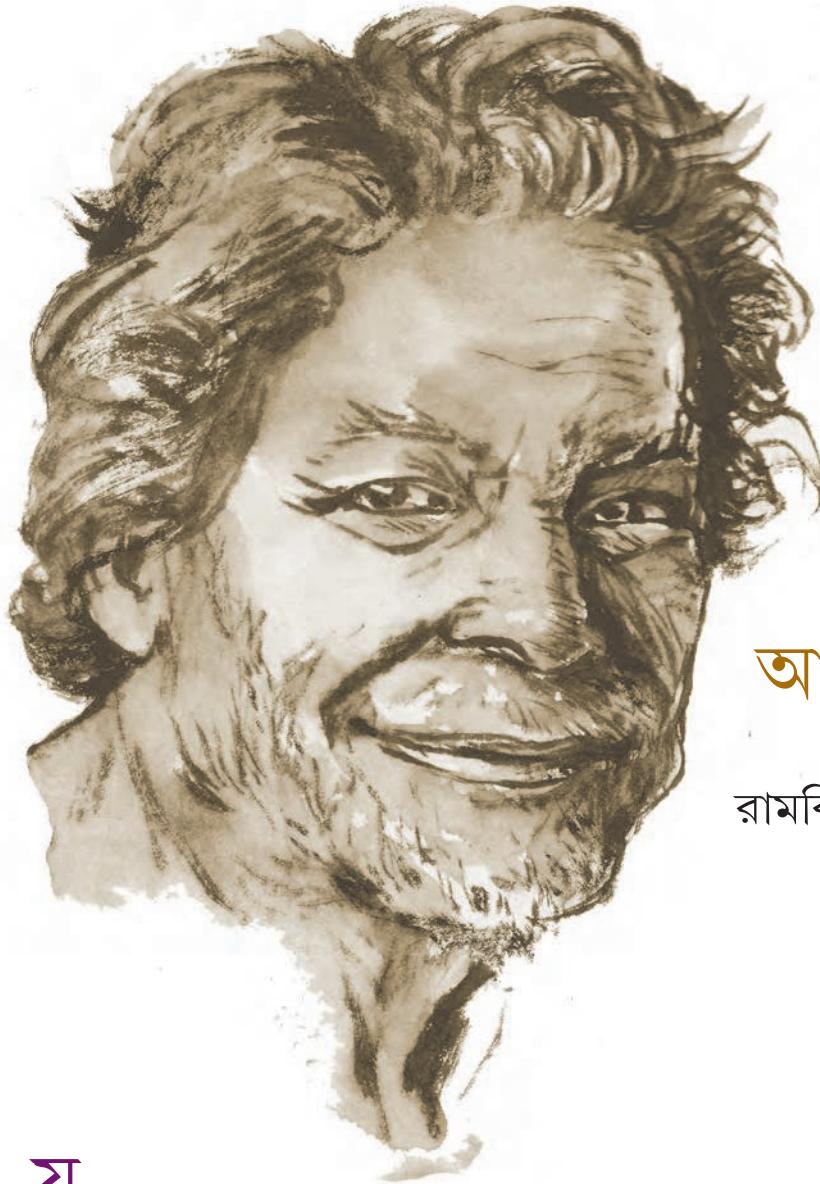
আত্মকথা

রামকিঙ্কর বেইজ

যতদূর মনে পড়ে শৈশবেই আমার চোখে পড়ত আমাদের বাড়িঘরের চারদিকের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি, ছবি আমার তখনই ভালো লাগত। ছোটোবেলাতে আমি সেই-সব দেখতাম আর কপি করতাম। ভিসুয়াল আর্টে আমার প্রথম বর্ণপরিচয়।

মূর্তিগড়ার ইতিহাসও খুব মজার। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা লাল-মোরামে ঢাকা ছিল। একদিন হঠাৎ বৃষ্টির পরে দেখি মোরাম ধুয়ে নীলরঙের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। চোখে পড়ামাত্র সেই মাটি খাবলে তুলে নিয়ে নানারকম পুতুল তৈরিও করতে লাগলাম। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার প্রথম শিল্পের-ইস্কুল বাড়ির পাশের কুমোরপাড়া। ছেলেবেলা থেকেই অনেকক্ষণ ধরে কুমোরদের মূর্তি গড়া ও অন্যান্য কাজ দেখার বেশ অভ্যেস ছিল। সুযোগ পেলেই মাটিতে হাত লাগিয়ে ছানাছানি করতাম।

রঙের প্রয়োজনও ছিল। গাছের পাতার রস, বাটনা-বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের পায়ের আলতা, মুড়ি-ভাজা খোলার চাঁছা ভুষোকালি—এইগুলি রঙের প্রয়োজন মেটাত। পাড়ার প্রতিমাকারক মিস্ত্রিদের দেখে ছাগলের ঘাড়ের লোম কেটে নিয়ে বাঁশের কাঠির ডগায় বেঁধে নিয়ে তাতে তুলির কাজ হতো।

বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় আমার অঙ্কন-গুণটির জন্য স্কুলে আমি অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে এসেছি। স্কুলের দেওয়ালে আঁকা-ছবি ঝোলানো আর পত্রিকায় ছবি দেওয়া আমার প্রতিমাসের কাজ ছিল।

ছোটোবেলাতে পড়াশুনা ভালো লাগত না। বাবা লিখতে দিলে আঁকতে শুরু করতাম। বাঁকুড়াতে ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছি। কিন্তু তা অ্যাকাডেমিক নয়। ইচ্ছে মতো পড়তাম।

এই-সবের মধ্যে কখন নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলন এসে গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ। ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হলাম আর কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলাম। আমার উপর ভার ছিল মহাপুরুষদের বাণী থেকে উদ্ধৃতি লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া আর প্রসেশনের সময় লিডারদের পোর্ট্রেট এঁকে দেওয়া। সেগুলি অয়েলপেন্ট দিয়ে করতে হতো।

এইসময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়ায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁরই কৃপায় ঘটে। সেটা হচ্ছে ১৯২৫ সাল। আমার এত আনন্দ হলো যে ম্যাট্রিক না দিয়েই চলে এলাম। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বাইরে।

চলে এলাম। এটা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। তিনি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) জেনারেল লাইব্রেরির উপরতলায় কলাভবনে নিয়ে গেলেন এবং আচার্য নন্দলালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন নন্দলালবাবুর শিল্প সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশি কিছু ছিল না। যা কিছু প্রবাসী'র অ্যালবামে দেখেছি। তা-ও বেশি নয়। ভারতীয় শিল্প ভালো লাগত না তা নয়— কিন্তু বাস্তবতার ভিতর দিয়ে না-গেলে সেটা সার্থক হবে না— এটাই ছিল মূল ধারণা। যার ফলে পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে প্রাকৃতিক বাস্তবতার সূচনা হয়েছে। এখনো চলছে। ছাত্রদের অ্যানাটমি ও মাস্‌ল সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমরা কাজ করতাম নিজেদের ইচ্ছামতন। নন্দবাবু নিজের কাজ করতেন। একবার করে ঘুরে যেতেন। বিশেষ কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতেন না। তবে হ্যাঁ, একটু আধটু যা না-বললেই না, তা কি আর বলতেন না? কিন্তু নিজে ইমপোজ করতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

অয়েল পেন্টিং তখন শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমিই প্রথম শুরু করি। দোকানে গিয়ে বললাম, 'অয়েল-পেন্টিং করব, কী রং আছে? কীভাবে করতে হয়, দেখান?' তা দোকানদার দেখাল, 'এই তুলি, এই টিউবে রং আর এই পাত্রে তেল আছে, একবার ডুবিয়ে নিয়ে রং করুন।' ব্যস, অয়েল পেন্টিং শেখা হয়ে গেল। ভালো কাজ করেছিলাম অয়েলে, যতদূর মনে হচ্ছে— গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ। নন্দলালবাবু কিন্তু একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অয়েলে করেছিলাম বলে। তবে বাধাও দেননি। আমি শান্তিনিকেতনে আসার বছর-চারেক আগে নন্দলালমশাই কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। ছাত্রদের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার খুব সুন্দর ছিল। সকলেই খুব সাহায্য করতেন। তবে তিনি তো ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রবর্তক। ওয়েস্টার্ন আর্টের প্রচলন তখনো হয়নি। উনি পছন্দও করতেন না।

আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলেম বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। আমার ছবি দেখতে চাইলেন। দেখালাম। বললেন, 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, দু-তিন বছর থাকো তো।' সেই দু-তিন বছর আমার এখনো শেষ হলো না। তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্প স্রোত নানাভাবে নানারূপে এসেছে তীব্রভাবে, কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়।

অত বড়ো একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, আমার সৌভাগ্য। শিল্পী হিসাবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। এত বড়ো পেইন্টার, এত নিখুঁত স্ট্রোক। প্রায় সমস্ত ছবিরই বিষয় বা ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র, কমন ল্যান্ডস্কেপ, একেবারে গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেকটার নিয়ে ওঁর ছবি। এই সাদামাটা সুরটাই আমাকে ভীষণভাবে টানে। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব সাধারণ, তা অনেকটা নন্দলালবাবুর পরোক্ষ প্রভাবে। *(নির্বাচিত অংশ)*

রামকিঙ্কর বেইজের আঁকা একটি প্রতিকৃতি

১. **ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ রামকিঙ্করের প্রথম শিল্পের-ইস্কুল বাড়ির পাশের—কামারপাড়া/কুমোরপাড়া/পটুয়াপাড়া।

১.২ 'পোর্ট্রেট' শব্দটির অর্থ হলো—প্রতিকৃতি/আত্ম-প্রতিকৃতি/প্রকৃতির ছবি।

১.৩ 'অয়েল পেন্টিং' বলতে বোঝায়—জলরঙে আঁকা ছবি/মোমরঙে আঁকা ছবি/তেলরঙে আঁকা ছবি।

১.৪ রামকিঙ্করের ছবি বা মূর্তি অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব— অসাধারণ/সাধারণ/নগণ্য।

২. **একই অর্থ-যুক্ত শব্দ রচনাংশ থেকে বেছে নিয়ে লেখো :**

বিনা ব্যয়ে, অভ্যুত্থান, দরকার, নিপুণ, সম্মাননীয়।

৩. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্য বদলাও :**

সার্থক, সুন্দর, মূর্তি, চরিত্র, উদ্ধৃতি

শব্দার্থ : কপি— অনুকরণ/নকল। ভিসুয়াল আর্ট— ছবি/চিত্রকলা। অ্যাকাডেমিক— প্রথাগত লেখাপড়া। নন্‌-কোঅপারেশন— অসহযোগ আন্দোলন। প্রসেশন— শোভাযাত্রা। পোর্ট্রেট— প্রতিকৃতি। অয়েল পেন্ট— তৈলচিত্র। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়— 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক। অ্যানাটমি— শরীরতত্ত্ব। মাসল—পেশি। ইনস্ট্রাকশন— নির্দেশ। ইমপোজ— আরোপ। ওরিয়েন্টাল আর্ট—শিল্পকলার প্রাচ্যধারা। ওয়েস্টার্ন আর্ট— শিল্পকলার পাশ্চাত্যধারা। পেইন্টার— শিল্পী।

৪. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ কী কী দিয়ে শিল্পী রামকিঙ্কর রঙের প্রয়োজন মেটাতেন?

৪.২ কার সৌজন্যে রামকিঙ্করের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ হয়?

৪.৩ শান্তিনিকেতনের আচার্য নন্দলাল বসু কাজের ক্ষেত্রে কেমন মনোভাব দেখাতেন?

৪.৪ নন্দলাল বসুর কাজের কোন দিকটা শিল্পী রামকিঙ্করকে বেশি প্রভাবিত করেছিল?

৫. **নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি নিয়ে দু-একটি বাক্য লেখো :**

নন্‌-কোঅপারেশন মুভমেন্ট, অয়েল পেন্টিং, আচার্য নন্দলাল বসু, ল্যান্ডস্কেপ।

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৬.১ 'ভিসুয়াল আর্টে আমার প্রথম বর্ণপরিচয়'— শিল্পী রামকিঙ্করের ছবির সঙ্গে প্রথম বর্ণপরিচয় হয়েছিলো কী ভাবে?

৬.২ 'জেনারেল লাইব্রেরির উপরতলায় কলাভবনে নিয়ে গেলেন'— কে কাকে নিয়ে গিয়েছিলেন? তারপর কী ঘটেছিলো?

৬.৩ ‘যতদূর মনে হচ্ছে—গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ’— কার উক্তি? ‘গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ’ কীসের নাম? তিনি কী ভাবে এ ধরনের কাজ শিখলেন?

৬.৪ ‘এই সাদামাটা সুরটা আমাকে ভীষণভাবে টানে’— কাকে টানে? ‘সাদামাটা সুর’ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? তাঁকে এই সুর টানে কেন?

৭. ‘সাহিত্য মেলা’ বইয়ের কোনো একটি কবিতা বা গল্প বা কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তুমি একটি ছবি এঁকে দেখাও। নিজের আঁকা ছবি নিয়ে পাঁচ/ছয়টি বাক্য লিখে নিজের মতামত জানাও।

রামকিঙ্করের স্কেচে মা ও ছেলে

রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০) : প্রখ্যাত ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ছবি আঁকায় পারদর্শী। দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন। কুমোর-কামারদের কাজেও আকৃষ্ট ছিলেন। পুতুল-গড়া, থিয়েটারের সিন-তৈরি, ছবি-আঁকা ইত্যাদি কাজে যুক্ত ছিলেন। শিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শান্তিনিকেতনে ১৯২৫ সালে নিয়ে আসেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে নন্দলাল বসু বলেছিলেন, ‘তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?’ সারাজীবন অজস্র ছবি এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন। তাঁর ছবিতে, ভাস্কর্যে রাঢ় দেশের মাটি ও মানুষের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার নানা বিশেষত্ব তাঁর কাজে ধরা পড়েছে।

শান্তিনিকেতনে তাঁর গড়া বিখ্যাত মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে—‘সুজাতা’, ‘হাটের সাঁওতাল পরিবার’, ‘গান্ধিজি’, ‘বুদ্ধদেব’, ‘কাজের শেষে সাঁওতাল রমণী’ ইত্যাদি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্বভারতী’ তাঁকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধিতে ভূষিত করে।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

আঁকা, লেখা

মৃদুল দাশগুপ্ত
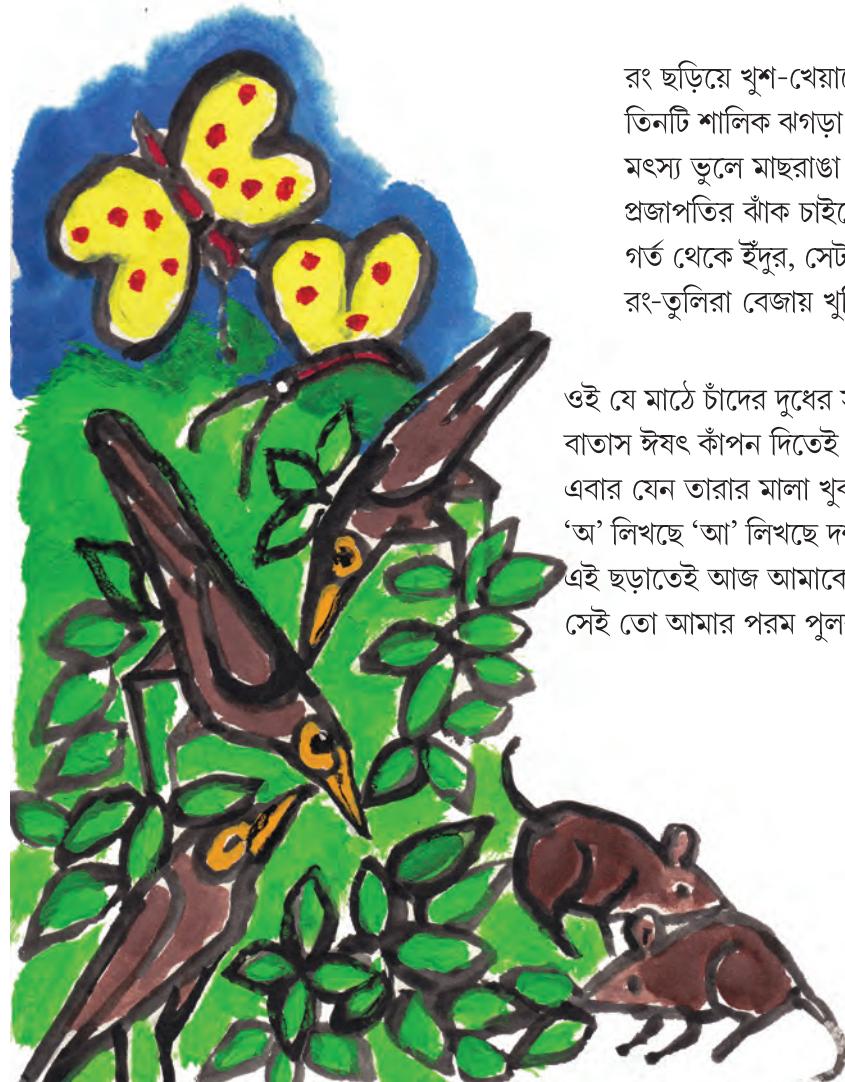
রং ছড়িয়ে খুশ-খেয়ালে আমি যখন চিত্র আঁকি
তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়, অবাক তাকায় চড়ুই পাখি
মৎস্য ভুলে মাছরাঙা তার নীল রংটি ধার দিতে চায়
প্রজাপতির ঝাঁক চাইছে তাদের রাখি আমার আঁকায়
গর্ত থেকে ইঁদুর, সেটাও পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে
রং-তুলিরা বেজায় খুশি আজ দুপুরে আমায় পেয়ে!

ওই যে মাঠে চাঁদের দুধের সর জমে যায় যখন পুরু
বাতাস ঈষৎ কাঁপন দিতেই আমার ছড়া লেখার শুরু
এবার যেন তারার মালা খুব গোপনে নামছে কাছে
'অ' লিখছে 'আ' লিখছে দশ জোনাকি বকুল গাছে
এই ছড়াতেই আজ আমাকে তোমার কাছে আনলো হাওয়া
সেই তো আমার পরম পুলক, সেই তো আমার পদক পাওয়া!

১. ‘পিটপিটে চোখ’— শব্দটির মানে ‘যে চোখ পিটপিট করে তাকায়’। এইরকম আরো পাঁচটি শব্দ তৈরি করো। একটি করে দেওয়া হলো— কুড়মুড়ে চানাচুর।

২. **ঠিক বানানটি বেছে নাও :**

২.১ মৎস্য / মৎস / মৎশ্য, ২.২ দুধের স্বর / দুধের সর / দুধের শর,

২.৩ কাপন / কাঁপন / কাঁপণ, ২.৪ ঈশৎ / ইষৎ / ঈষৎ

শব্দার্থ : খুশ খেয়াল—খামখেয়াল, মর্জি। ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ। চিত্র—ছবি, আলেখ্য , প্রতিলিপি। কাঁপন—কম্পন, স্পন্দন। মৎস্য—মাছ, মীন। পুলক—রোমাঞ্চ, আনন্দ। সর—দুধ, দই প্রভৃতির উপরের ঘন নরম আবরণ। পদক—কণ্ঠভূষণ, লকেট। পিটপিটে—মিটমিটে, আধচোখে দেখা। বেজায়—অত্যন্ত, খুব। পুরু —ঘন, স্থূল। পরম—চরম, অত্যন্ত।

৩. **নীচে দেওয়া শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

সামান্য, আনন্দ, মীন, নক্ষত্র, মূষিক।

৪. ‘কম্পন’ শব্দ থেকে এসেছে ‘কাঁপন’ শব্দটি, অর্থাৎ ‘ম্প’ যুক্তাক্ষরটি ভেঙে যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া ‘ম’ আগের ধ্বনিটিকে অনুনাসিক করে তুলেছে এবং একটি নতুন ‘আ’ ধ্বনি চলে আসছে। এই নিয়মটি মনে রেখে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো।

৫. একসঙ্গে অনেক প্রজাপতি থাকলে আমরা বলি 'প্রজাপতির ঝাঁক'। এইভাবে আর কী কী শব্দ তৈরি করা যায় শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে দেখো।

৫.১ ভেড়ার________, ৫.২ কইমাছের ________,
৫.৩ হস্তী________, ৫.৪ নৌকার________,
৫.৫ সুপুরি গাছের________, ৫.৬ ছাত্রদের________,

সারি, যূথ
ঝাঁক, দল
বহর, পাল

৬. **নীচের বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ লেখো :**

রং, চিত্র, মাঠ, লেখা, পুলক।

৭. **নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

৭.১ ঈষৎ________, ৭.২ বেজায়________, ৭.৩ পিটপিটে________,
৭.৪ পরম________, ৭.৫ নীল________, ৭.৬ গোপন________।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

গোপন, ঈষৎ, খুশি, পুরু, ঝগড়া।

৯. **নিম্নরেখ অংশগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়।
৯.২ গর্ত থেকে ইঁদুর, সেটাও পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে।
৯.৩ প্রজাপতির ঝাঁক চাইছে তাদের রাখি আমার আঁকায়।
৯.৪ এবার যেন তারার মালা খুব গোপনে নামছে কাছে।
৯.৫ সেই তো আমার পদক পাওয়া।

১০. **বাক্য বাড়াও :**

১০.১ আমি যখন আঁকি। (কী, কীভাবে?)
১০.২ চাঁদের দুধের সর জমে যায়। (কোথায়? কেমন?)
১০.৩ পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে। (কে? কোথা থেকে?)
১০.৪ ছড়া লেখার শুরু। (কার? কখন?)
১০.৫ 'অ' লিখছে 'আ' লিখছে। (কারা? কোথায়?)

মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫): হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে জন্ম। লেখাপড়া করেছেন উত্তরপাড়া কলেজে। বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান। প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'জলপাই কাঠের এসরাজ'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- 'এভাবে কাঁদে না', 'গোপনে হিংসার কথা বলি', 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য ছড়ার বই- 'ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি', 'ছড়া ৫০', 'আমপাতা জামপাতা'। প্রবন্ধগ্রন্থ- 'কবিতা সহায়'। তিনি বর্তমানে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত।

১১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ কবি কখন ছবি আঁকেন?
১১.২ কখন তাঁর ছড়া লেখার শুরু?
১১.৩ তিনটি শালিক কী করে?
১১.৪ কে অবাক তাকায়?
১১.৫ মাছরাঙা কী চায়?
১১.৬ প্রজাপতিদের ইচ্ছা কী?
১১.৭ গর্তে কে থাকে?
১১.৮ চাঁদের পুরু দুধের সর কোথায় জমে?
১১.৯ কারা, কোথায় অ-আ লিখছে?
১১.১০ কবি কোন বিষয়কে 'পদক পাওয়া' মনে করেছেন?

১২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

১২.১ কবি যখন ছড়া লিখতে শুরু করেন তখন চারপাশের প্রকৃতিতে কী কী পরিবর্তন ঘটে ?
১২.২ কবি যখন ছবি আঁকেন তখন কী কী ঘটনা ঘটে?
১২.৩ 'তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়'—কোন কবির কোন কবিতায় এমন তিন শালিকের প্রসঙ্গ অন্যভাবে আছে?
১২.৪ মাছরাঙা পাখি কেমন দেখতে? সে মৎস্য ভুলে যায় কেন?
১২.৫ "রং-তুলিরা বেজায় খুশি আজ দুপুরে আমায় পেয়ে।" — কবির এমন বক্তব্যের কারণ কী?
১২.৬ "'অ' লিখছে 'আ' লিখছে'—কারা কীভাবে এমন লিখছে? তাদের দেখে কী মনে হচ্ছে?

১৩. অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৩.১ 'এই ছড়াতেই আজ আমাকে তোমার কাছে আনলো হাওয়া'—কাকে উদ্দেশ্য করে কবি একথা বলেছেন? কবির আঁকা এবং লেখা-র সঙ্গে এই মানুষটির উপস্থিতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব বিচার করো।
১৩.২ এই কবিতায় যে যে উপমা ও তুলনা ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি ব্যবহারের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।
১৩.৩ ছবি আঁকা, ছড়া/কবিতা লেখার মধ্যে তুমি নিজে কোনটা, কেন বেশি পছন্দ করো তা লেখো।
১৩.৪ তোমার নিজের লেখা ছড়া / কবিতা, নিজের আঁকা ছবিতে ভরিয়ে চার পাতার একটি হাতে লেখা পত্রিকা তৈরি করো। পত্রিকার একটি নাম দাও। তারপর শিক্ষিকা/ শিক্ষককে দেখিয়ে তাঁর মতামত জেনে নাও।

খোকনের প্রথম ছবি

বনফুল

খোকন এখন বড়ো হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে। ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে তার। সে যখন খুব ছোটো ছিল কাগজের উপর রঙিন পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত। তারপর ক্রমশ বড়ো হলো, স্কুলে গেলো। স্কুলে ড্রইং শেখানো হতো। ড্রইং শিখতে লাগল খোকন। টুল, টেবিল, চেয়ার, কলসি, কাপ এমন কি একটা গোরুও এঁকে ফেলল একদিন। তারপর ড্রইং বুক থেকে কপি করে করে অনেক ছবি আঁকল সে। নানারকম ছবি। যেখানেই সে ছবি দেখত, দেখে দেখে এঁকে ফেলত। একদিন তার ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই বললেন—প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—প্রকৃতি থেকে?

হ্যাঁ, তোমার চারপাশে তো অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো দেখে দেখে আঁকো না এবার। তোমার বাড়ির সামনেই তো চমৎকার গাছ আছে একটি। তার ছবিটা এঁকে ফেলো একদিন।

খোকন সত্যি সত্যি এঁকে ফেলল একদিন ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। মাস্টারমশাই বললেন—চমৎকার হয়েছে। আরো আঁকো। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকে যে পুলটা দেখা যায়, সেটা আঁকতে পারবে?

পারব—

পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টারমশাই। বললেন, চারপাশে যা দেখবে এঁকে ফেলবে। খুব বড়ো চিত্রকর হবে তুমি।

খোকন মহা উৎসাহে আঁকতে লাগল ছবি। কিন্তু কিছুদিন পরে সে নিজেই বুঝতে পারল ঠিক হচ্ছে না। সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়। সূর্যের দীপ্তি তো ছবিতে ফোটেনি। গোলাপ ফুলের ছবিতে কি গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ফোটাতে পেরেছে সে? পারেনি। প্রকৃতির ছবি ঠিক আঁকা যায় না। একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন। একদিন সে দেখল আকাশে একটা মেঘ হাতির মতো। ঠিক যেন একটি হাতি পেছনের দুপায়ে ভর করে শুঁড় তুলে আছে। খোকন তাড়াতাড়ি তার ড্রইং খাতায় ছবিটা আঁকতে লাগল। আঁকা শেষ হবার পর মিলিয়ে দেখতে গেল ঠিক হয়েছে কিনা। গিয়ে দেখে—হাতি নেই, প্রকাণ্ড একটা কুমির শুয়ে আছে। হাতি কুমির হয়ে গেছে।

খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন। একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

খোকনের বাবা তাঁকে বললেন—খোকনও ছবি আঁকছে।

তাই নাকি! দেখি দেখি—

খোকন সগর্বে তার ড্রইং খাতাগুলো নিয়ে এল।

ওরে বাস, অনেক ছবি এঁকেছ দেখছি—একে একে উল্টে বললেন, তোমার ছবি কই? এ সবই তো কপি করেছ। তুমি বড়ো হয়ে ক্যামেরা নিয়ে যদি এদের ফটো তোলো তাহলে এগুলো আরও নিখুঁত হবে। এগুলো সব নকল করা ছবি। তোমার নিজের আঁকা ছবি কই?

খোকন অবাক হয়ে গেল।

নিজের আঁকা ছবি? তা কী করে আঁকব?

চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেলো।

চিত্রকর চলে গেলেন।

খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। খোকন ঠিক করল এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে। কালো রং আর তুলি নিয়ে শুরু করে দিল আঁকতে। ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রঙে ভরে গেল।

তারপর সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোকন। এটা কী রকম ছবি হলো? এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তবু।

তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভেতরই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে।

নিজের প্রথম সৃষ্টির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।

বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৯) : ‘বনফুল’ হলো সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর প্রথম কবিতা ‘মালঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত। এরপর ‘প্রবাসী’ ও ‘ভারতী’ পত্রিকায় তিনি ‘বনফুল’ ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’ ডাক্তারি জীবনের প্রথম দিকের রচনা। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটোগল্পেরও জনক তিনি। ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য-সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য রচনা—‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’, ‘মন্ত্রমুগ্ধ’, ‘হাটেবাজারে’, ‘শ্রীমধুসূদন’, ‘বিদ্যাসাগর’ প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘পশ্চাৎপট’ রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী পদক’ আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

শব্দার্থ : ঝোঁক— আগ্রহ/প্রবণতা। হিজিবিজি— আঁকিবুঁকি। ড্রইং—আঁকা। পুল—সেতু বা সাঁকো। চিত্রকর—শিল্পী, যিনি ছবি আঁকেন। নকল—অনুকরণ।

১. গল্প থেকে একইরকম অর্থযুক্ত আর একটি করে শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :

শিল্পী, নগর, ঐরাবত, উজ্জ্বলতা, অনুকরণ।

২. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে রূপান্তরিত করো :

প্রকৃতি, গাছ, কল্পনা, ফুল, দীপ্তি।

৩. নিম্নরেখ অংশটির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

৩.১ প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

৩.২ তোমার ছবি কই?

৩.৩ একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

৩.৪ ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রঙে ভরে গেল।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

৪.১ ‘ড্রইং শিখতে লাগল খোকন’— খোকন কোথায় ড্রইং শিখত? আর প্রথমদিকে কী কী আঁকত?

৪.২ ‘একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন’— ‘বেকুব’ শব্দটির অর্থ কী? মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে খোকন বেকুব হয়ে গিয়েছিল কেন?

৪.৩ ‘এগুলো সব নকল করা ছবি।’— কে কাকে এই কথা বলেছেন? ‘নকল করা ছবি’ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন?

৫. নীচের প্রতিটি বাক্যকে দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো :

৫.১ সে যখন খুব ছোটো কাগজের উপর রঙিন পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত।

৫.২ পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টারমশাই।

৫.৩ সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়।

৫.৪ একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন।

৫.৫ খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল।

৬ নীচের আলাদা আলাদা বাক্যগুলি জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করো :

৬.১ খোকন বড়ো হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে।

৬.২ খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন।

৬.৩ নিজের আঁকা ছবি? তা কী করে আঁকব?

৬.৪ চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেলো।

৬.৫ তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভেতরেই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে।

৭. গল্পে রয়েছে এমন দশটি ইংরেজি শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

৮. 'খোকন জিজ্ঞেস করলে—প্রকৃতি থেকে?'—প্রশ্ন পরিহার করো।

৯. লক্ষ্ণৌ শহরটি কোথায়? সেখানকার একটি বিখ্যাত স্থাপত্যের নাম লেখো।

১০. খোকনের 'ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই' কীভাবে খোকনকে প্রকৃতি দেখতে শিখিয়েছিলেন?

১১. প্রকৃতির দৃশ্যের যে বদল অহরহ হয় তা খোকন কীভাবে বুঝল?

১২. 'খোকন অবাক হয়ে গেল,' আর

'...অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।'

—এই দুই ক্ষেত্রে খোকনের 'অবাক' হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

১৩. 'চিত্রকর চলে গেলেন'

—এই চিত্রকরের পরিচয় দাও। চলে যাওয়ার আগে তিনি খোকনকে কী বলে গেলেন?

১৪. 'এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে।'

—কখন খোকন এমন সিদ্ধান্ত নিল? অন্ধকারের সেই ছবির দিকে তাকিয়ে খোকন কী দেখতে পেল?

১৫. গল্পে 'খোকনের প্রথম ছবি' হিসেবে তুমি কোন ছবিটিকে স্বীকৃতি দেবে এবং কেন তা বুঝিয়ে লেখো।

১৬. পাঁচজন সাহিত্যিকের নাম এবং তাঁদের ছদ্মনাম পাশাপাশি লেখো। সাহিত্যিকেরা কেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন তা শিক্ষক/শিক্ষিকার থেকে জেনে নাও।

১৭. তুমি যদি বড়ো হয়ে সাহিত্যিক হও, কোন ছদ্মনাম তুমি ব্যবহার করবে এবং কেন— তা লেখো।

১৮. খোকনের ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই আর তার বাবার এক বন্ধু যে যে ভাবে তাকে ছবি আঁকতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা লেখো। কোন রীতিটিকে তোমার পছন্দ হলো এবং কেন তা যুক্তিসহ লেখো।

কুতুব মিনারের কথা

সৈয়দ মুজতবা আলি

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হলো—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশি' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশি, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কী ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলক (যিনি অশোক স্তম্ভ দিল্লি আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমরাত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লির অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বেল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদিরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কী ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কী রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মালমশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোটো করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশি', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে। 'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত নিদর্শন পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশি ও কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবি লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছেন মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টি কার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশি, কোনো ইমারতে হিন্দুদের প্রাধান্য বেশি। আটশত বছর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কেউ কোনো মিনার কখনো খাড়া করে নি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারত গড়েছেন, কিন্তু 'কুতুবের চেয়ে ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখাননি। যে ইংরেজ

দিল্লিতে সেক্রেটারিয়েট,রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।

আলাউদ্দিন খিলজির মতো দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম সাইজ আছে— অর্থাৎ যার চেয়ে বড়ো হলে ইমারত খারাপ দেখায়, ছোটো হলেও খারাপ দেখায় (সর্বকলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)— কাজেই আলাউদ্দিনের চূড়া ডবল হলে ফল কী ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে না হতেই ওপারের ডাক খিলজির কানে এসে পৌঁছল, যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

কুতুব মিনারের গায়ের কাজ

আপন মহিমায় নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার। মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসাবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট---মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তার মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘোড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।
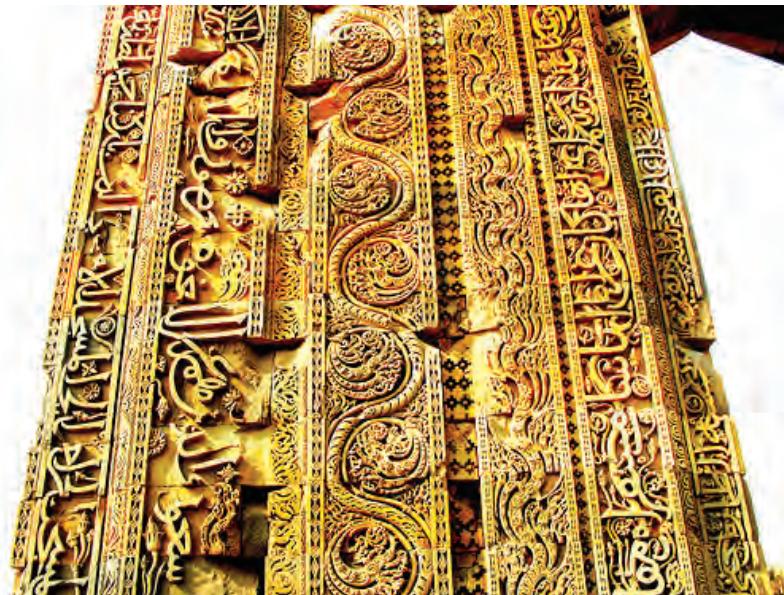
দিল্লি-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে, গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধহয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমেদের—এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানি সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪—১৯৭৪) : জন্ম শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দর আলি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছাড়েন। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপক হন। তিনি আরবি, ফারসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনি', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'শবনম', 'ধূপছায়া', 'টুনিমেম', 'হিটলার' প্রভৃতি। তিনি 'নরসিংহদাস পুরস্কারে' সম্মানিত।

১. অনধিক দুটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১.১ কোন সম্রাট 'অশোক স্তম্ভ' কে দিল্লি নিয়ে এসেছিলেন?

১.২ কুতুব মিনার নামটি কার নামানুসারে রাখা হয়েছে এবং কেন?

১.৩ কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আর কে মিনার গড়তে চেষ্টা করেছিলেন?

১.৪ মিনারেট বা মিনারিকা কী? মিনারের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?

১.৫ আহমদাবাদ শহরটি কোন রাজার নামানুসারে হয়েছে? এই শহরটি কোন রাজ্যের রাজধানী?

২. নীচে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

কানিংহাম, ফার্গুসন, সৈয়দ আহমেদ।

শব্দার্থ : মিনার— মোচার আকারে বা শাঁখের মতো ঊর্ধ্বমুখী উন্নত চূড়া। মোগল কলা— মুঘল আমলের শিল্প সংস্কৃতি। এক্সপেরিমেন্ট— পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সিক্রি— এখানে ফতেহ্‌পুর সিক্রি। স্থপতি— সৌধ, প্রাসাদ, ইমারত প্রভৃতি তৈরির কাজে নিযুক্ত। গুলদস্তাজ— মিনারেট জাতীয় ছোটো চূড়া বা শীর্ষদেশ। থাম— স্তম্ভ। আর্চ— খিলান। ছত্রি— চাল বা ছাদ। মিনারেট— মিনারের চেয়ে ছোটো চূড়া। ছজ্জা— বৃষ্টির ছাট ঠেকানোর জন্য দরজা বা জানলার উপরস্থিত ছাদের প্রলম্বিত অংশ। ব্র্যাকেট— প্রধানত দেওয়ালের গায়ে আটকানো তাকের প্রলম্বিত আলম্ব বা দেয়ালগিরি। প্রপর্শন— সঙ্গতি। অপটিমাম সাইজ— সামঞ্জস্যপূর্ণ আকার। ডোম— গোলাকার গম্বুজ। জিওমেট্রিক ডিজাইন— জ্যামিতিক বিন্যাস। দার্ঢ্য— দৃঢ়তা।

৩. কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ 'কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার'— এই উদ্ধৃতিটির আলোকে মিনারটির পাঁচটি বিশিষ্টতা উল্লেখ করো।

৩.২ মিনারটির গঠনে হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলনের চেহারাটি কীভাবে ধরা পড়েছে তা লেখো।

৩.৩ কুতুব মিনারের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গিয়ে লেখক আর কোন কোন স্থাপত্য কীর্তির প্রসঙ্গ এনেছেন?

৩.৪ আলাউদ্দিন খিলজি চেষ্টা করেও কুতুব মিনারের চেয়ে মহত্তর স্থাপত্য গড়তে পারেননি কেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
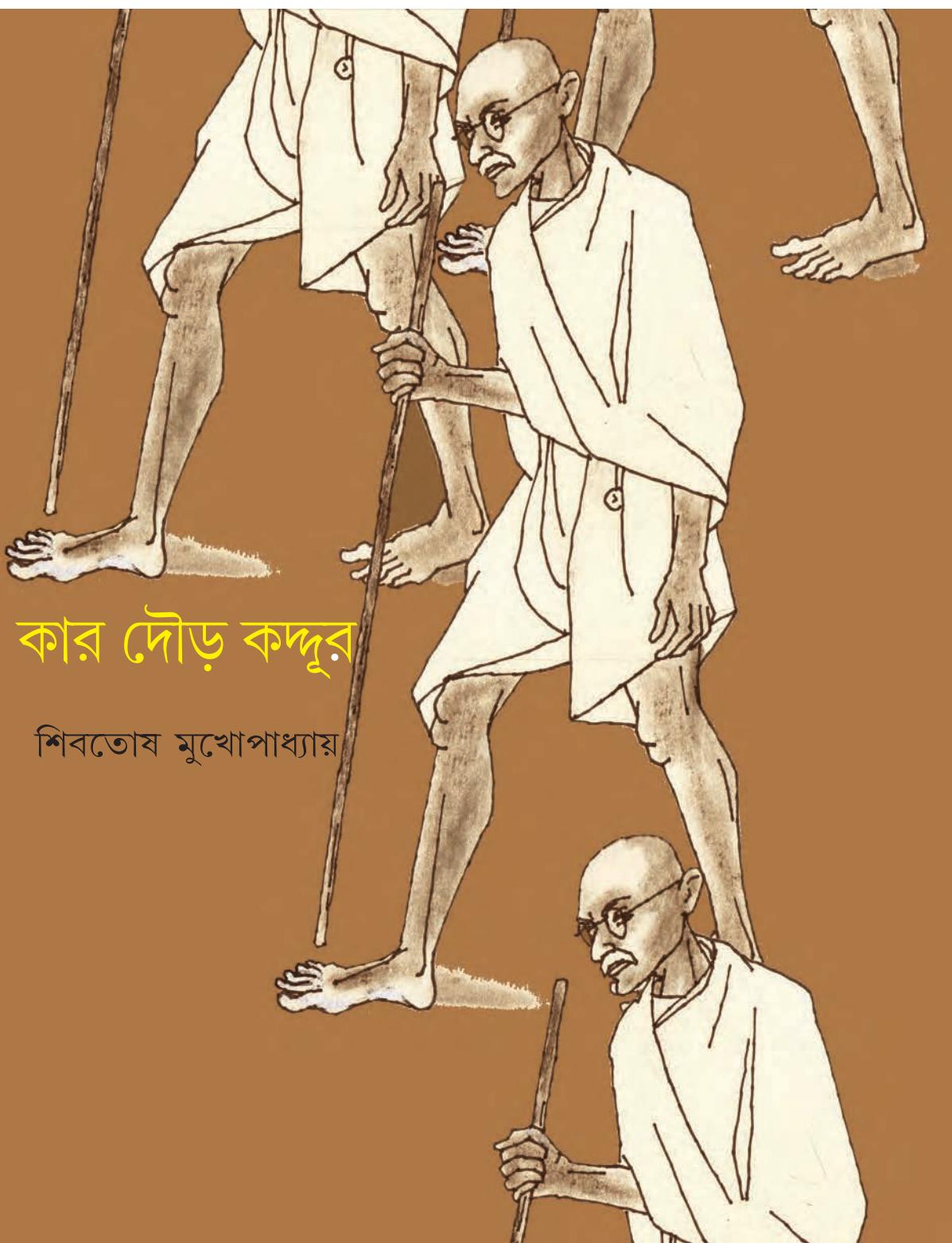
কার দৌড় কদ্দূর

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ইঁদুরের দৌড় তার গর্তের পানে। নদীর দৌড় সাগরে। খবরের দৌড় কানের দিকে। আঘ্রাণের দৌড় নাকের দিকে। সুন্দরের দৌড় স্বভাবত বিদ্যার দিকে। খদ্দেরের দৌড় দোকানের দিকে। রোগীর দৌড় ডাক্তারের কাছে। সুখের দৌড় দুঃখের দিকে। দুঃখের দৌড় সুখের দিকে। জন্মের দৌড় মৃত্যুর দিকে আর মৃত্যুর দৌড় জন্মের দিকে। প্রত্যাশীর দৌড় মরীচিকার পিছু-পিছুতে। আপেল দৌড়ায় মাটির দিকে। গাছ মাত্রেই দৌড়াতে নারাজ। আর প্রায় সমস্ত প্রাণীই চলতে সক্ষম। গাছরা দৌড়ায় না। তার বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কারণ যে তারা এক জায়গায় ঠায় বসে বসেই খাবার তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রাণীদের এক জায়গায় বসে খাবার তৈরি করবার মতো নিজেদের কোনো ভিয়েন নেই। প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয়। এই কারণেই প্রাণীরা এক জায়গায় স্থাণু না হয়ে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে। রসনা রটনা করে এদিকে কিংবা ওদিকে। তা বলে দুনিয়ার সব প্রাণীই কুইক মার্চ করে খেতে দৌড়য় না। কেউ কেউ দৌড়য় আস্তে কিংবা জোরে — আপনার কৃতিত্বে কেউ বা গা দিয়ে কেউ বা পা দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়।

অণুবীক্ষণের তলাকার অদ্ভুত বিস্ময়ের জীব অ্যামিবা, যার দেহ বলতে একখানি সেল ছাড়া কিছু নেই, তার চলবার ভঙ্গিটি বড়ো মজার। নিজের দেহ থেকে অর্থাৎ সেল থেকে খানিক অংশ ক্ষণিকের পা হিসাবে আগিয়ে দেয়, সেইদিকে তারপর সেলের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশকে গড়িয়ে দেয়, এমনি করে মুহুর্মুহু ক্ষণিক-পা বার হয় আর প্রোটোপ্লাজম সেদিকে বয়ে যায়। কত মন্দগতিতে অ্যামিবা যে চলে তা একরকম অনুমানই করা যায় না। যখন আকাশে একটি জেট প্লেন ঘণ্টায় কয়েক শো মাইল বেগে চলছে তখন অ্যামিবা কয়েক মিনিটে কয়েক মিলিমিটার অতিক্রম করতে পারছে। রক্ষে এই যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে অ্যামিবা এমন করেই চলেছে— একেবারে কখনও থেমে যায়নি। আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একরকম ভবঘুরে সেল আছে যারা অ্যামিবার মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। এরা শরীরের সৈন্য সামন্ত। বহিঃশত্রুকে নাশ করতে ছুটে যায়। এ ছাড়া আর একরকমের এককোষী জীব প্যারামোসিয়াম— তার সেলের চারদিকে ছোটো ছোটো চুলের মতো বহিরাংশ আছে। তাদের সিলিয়া বলা হয়। এই সব সিলিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্যারামোসিয়াম জলের মধ্যে হাজার দাঁড়ে নৌকা চালানোর মতো আগাতে বা পিছুতে পারে।

গমনাগমনের প্রকৃত মাধুর্যটা আমাদের চোখে পড়ে সাধারণত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে। সমুদ্র স্রোতের সঙ্গে কত সামুদ্রিক জীব গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেয় তার হিসাব আমরা রাখি না। চিংড়িরা দাঁড়া নাড়া দিয়ে চলে। কোনো কোনো পতঙ্গ উড়বার সময় তাদের ডানা প্রচণ্ড জোরে নাড়ে। এফিড উড়বার সময় প্রতি সেকেন্ডে চারশোবার ডানা নাড়ায়, আর এক নাগাড়ে আট মাইল পথ উড়ে যেতে পারে। বাগানের শামুকরা চলে তাদের একখানি মাংস-পুরু পা দিয়ে, চলে যাবার সময় রেখে যায় জলীয় চিহ্ন— তা দেখলে বলতে ইচ্ছে করে 'এ পথে আমি যে গেছি।' উচ্চতর জীবদের মধ্যে গমন শক্তির অনেক কলা কুশলতা। কিন্তু গমন শক্তিকে বিচার করতে হয় সব সময় দৈহিক ওজনের পরিমাণ হিসাব করে। কত ভারী জন্তু কত ওজন নিয়ে কত সময় কত দূর গেছে তাই বিবেচ্য। হাল্কা কোনো পাখির হাওয়ায় তিরের মতো ছুটে চলে যাওয়া আর বেজায় ওজন নিয়ে একখানি হিপোর কাদা ভেঙে থপ থপ করে যাওয়া একরকম মনে করলে ভুল হবে।

এই ধরুন, চিতা বাঘের দেহের ওজন একশো তিরিশ পাউন্ডের মতো। সে ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। নেকড়ে প্রায় একই ওজনের হলেও তার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩৬ মাইল মাত্র। সেই তুলনায় হিপোর শরীরের ওজন আঠাশশো পাউন্ড এবং সে প্রতি ঘণ্টায় ২০/৩০ মাইল চলতে পারে।

গোবি মরুভূমিতে গ্যাজেলি নামক এক হরিণ আছে তার গতিশক্তি অত্যধিক। দেহের ওজন আশি পাউন্ড কিন্তু সে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলতে পারে। এন্টিলোপ হরিণ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে দৌড়ায় ১১০ পাউন্ড ওজন নিয়ে। সেই গল্পে আছে কচ্ছপের কাছে খরগোশ দৌড়ের বাজিতে হার মেনেছিল। নানা জাতের খরগোশের

মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত খরগোশ মাত্রই তীব্র গতিসম্পন্ন। দেহের ওজন যখন ৫ পাউন্ড, গতিবেগ তখন ৪৫ মাইল ঘণ্টায়, মোটরের দৌড়ের কাছাকাছি। রেস হর্সের দেহের ওজন ১০০০ পাউণ্ড, প্রতি ঘণ্টায় তার ছুট ৪০/৪২ মাইল। অনেক বুনো গাধার দৌড়ের বহর ঘোড়ার সমান কিন্তু তাদের দেহের ওজন ঘোড়ার চেয়ে কম— মাত্র ৩০০ পাউন্ডের মতো। গ্রে হাউণ্ডের দেহের ওজন মাত্র ২২ পাউন্ড, সেই অনুপাতে তার চলৎশক্তির বেগ ঘণ্টায় ৩৬ মাইল।

পাখিরা বহুদূরত্ব পার হতে পারে। মেরুপ্রদেশের টারনস প্রতি বছর এগারো হাজার মাইল একবার উড়ে আসে আবার পরে ফিরে যায়। কোনো কোনো হক্‌জাতীয় পাখি ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল বেগে উড়তে পারে। এমন পাখি আছে যার গতিবেগ আরও বেশি— ঘণ্টায় দুশো মাইল। আফ্রিকার ইন্‌ জাতীয় পাখি ওড়া ছেড়ে হাঁটায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। দেহের ওজন ১১০ পাউন্ড হলে কী হয়, তারা ঘণ্টায় ৩১ মাইল বেগে চলতে পারে। কাঙারুর চলন প্রায় ইমুর চলনের কাছাকাছি—ঘণ্টায় ৩০ মাইল আর দেহের ওজন ১৩০ পাউন্ড। মোষের দেহের বহর যত, তাতে ওজন দাঁড়ায় ১৮০০ পাউন্ড, সেই তুলনায় গতিবেগ নেহাৎ কম নয়-ঘণ্টায় ৩০ মাইল। হাতির বপু বিরাট, ওজন ৭০০০ পাউন্ড। সেই নিয়ে গদাই লস্কর চালে সে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ছোটে। শেয়াল তার ১২ পাউন্ড ওজন নিয়ে ২০ মাইল বেগে মাত্র যেতে পারে। বরাহের দেহের ওজন অনেক বেশি, ৯০ পাউন্ড। চলৎশক্তি দেখা গেছে ঘণ্টায় ১১ মাইল মাত্র। সজারুর দেহের ওজন যেমন মাত্র ৩ পাউন্ড, তার চলার শক্তিও সীমিত— ঘণ্টায় মাত্র ২ মাইল। উচ্চতর জীবরা পেশির সঞ্চালনের সাহায্যে পা নাড়াতে পারে। যখন কোনো পেশি কাজ করে তখন এডিনোসসিন ট্রাইফসফেট (ইংরাজিতে ATP বলা হয়) নামক রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়।

বাইরের চলাটা আসল নয়। এ পৃথিবীতে সব চলার মাঝে যা সত্যকারের চলা তা হল মানুষের নিজের চলা তার মন-ভূমির মধ্যে। মানুষের মনের গতিবেগ আলোর গতিসম্পন্ন—ঘণ্টায় ১৮৬০০০ মাইল। তার কোথাও যেতে নেই মানা। ক্রমবিকাশের দুস্তর পথ পেরিয়ে মানুষ এমন মন পেয়েছে। মনকে চালাবার ক্ষমতাও। মন তার রথ। মন রথ অবাধ। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জানা যায় ঘোড়ার পূর্ব পুরুষদের এখনকার ঘোড়ার মতো খুর ছিল না। হাতে-পায়ে পাঁচ আঙুল বিশিষ্ট জীব ছিল তারা। কিন্তু ক্রমবিকাশের পথ পরিক্রমায় আস্তে আস্তে অন্য আঙুলগুলি অদৃশ্য হলে রইল শুধু মাঝের আঙুলটি, যাকে আমরা খুর বলে জানি। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে চমক লাগিয়ে ছুটে চলে যায়। কিন্তু মনের দৌড়ে ঘোড়া ততকিছু নয়। মনের দৌড়ে মানুষ চ্যাম্পিয়ন। এই মনকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ যুগে যুগে কালে কালে পদচালনা করেছে দিকে দিকে। হুয়েনসাঙ এসেছেন সুদূর চিন থেকে তাঁর মনকে সঙ্গে নিয়ে। ভারতের শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর গেছেন তিব্বতে, ভাসকো-ডা-গামা এসেছেন তুমুল সমুদ্র পেরিয়ে ভারতবর্ষে। আর কলম্বাস তাঁর দুর্জয় মনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছেন। শঙ্করাচার্য পদব্রজে সারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে গেছেন ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করবেন বলে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে মানুষ এখন শুধু নিজে চলেই ক্ষান্ত নয়। সে অন্য সবকিছুকেও চালাতে সমান উৎসুক। জাহাজ, রেল, প্লেন, জেট। এখন মানুষ আকাশটাকে নতুন করে ঘৌড়দৌড়ের মাঠ করে তুলেছে। সেখানে নতুন বাজি ধরেছে যে সে ত্রিভুবনেশ্বর হবে, স্বর্গমর্ত তোলপাড় করবে। তাই জীবনের ৪৪০তে মানুষ বিশ্বকীর্তি স্থাপন করেছে।

কিন্তু 'ক্ষণিকের-পা' দিয়ে, কেউ সিলিয়া দিয়ে, কেউ দাঁড়া দিয়ে— নানা রকমের পা দিয়ে সবই চলেছে। চারিদিকে সবাই ছোটাছুটি করছে, কীসের এ জয়যাত্রা, এত ত্বরা? পৃথিবীটাও পাগলের মতো হন হন করে ছুটে চলেছে। পৃথিবীটাকে আমি একবার শুধিয়েছিলাম— তোমার কেন চলবার জন্য এত দায়। এ যাত্রা তোমার থামাও। সূয্যি তো কারুর পিছু পিছু ধাওয়া করছে না? তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি করছো?

তার উত্তরে পৃথিবী কী জানিয়েছিল জানেন? তার দখিনা হাওয়ার ভিতর দিয়ে সে আমার কানে কানে বলেছিল— থামা মানে জীবনের শেষ। যতদিন আছো ততদিন চলো, দাঁড়িও না। শাশ্বত সত্যের দিকে যাওয়ার গতি বন্ধ করো না। চরৈবেতি...

১. **ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

১.১ উপনিষদে উক্ত ‘চরৈবেতি’ শব্দের অর্থ (যাত্রা থামাও/এগিয়ে যাও/দাঁড়িও না)।

১.২ পৃথিবী যে নিজের কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা প্রথম বলেন (গ্যালিলিও/ কোপারনিকাস সক্রেটিস)।

১.৩ ভাস্কো-ডা-গামা ছিলেন (মার্কিন/পর্তুগিজ/গ্রিক)।

১.৪ যে বৈজ্ঞানিক কারণে ‘আপেল দৌড়ায় মাটির দিকে’, সেটি হলো (মাধ্যাকর্ষণ/ প্লবতা/ সন্তরণ-নিয়ম)

১.৫ আইনস্টাইন ছিলেন (সপ্তদশ/অষ্টাদশ/উনবিংশ) শতাব্দীর মানুষ।প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয় — গাছ কীভাবে না দৌড়ে তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে?

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো:**

২.১ এফিড উড়বার সময় প্রতি সেকেন্ডে________বার ডানা নাড়ায়।

২.২ গমন শক্তিকে বিচার করতে হয় সবসময়ে ________ হিসাব করে।

২.৩ গোবি মরূভূমিতে ________ নামক এক হরিণ আছে।

২.৪ ________ টারনস প্রতি বছরে এগারো হাজার মাইল একবার উড়ে আসে আবার পরে ফিরে যায়।

২.৫ ATP র পুরো কথাটি হলো________।

৩. **অতি-সংক্ষিপ্ত আকারে নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও:**

৩.১ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এমন দুটি প্রাণীর নাম লেখো।

৩.২ ‘শামুক চলে যাবার সময় রেখে যায় জলীয় চিহ্ন’- সেটি আসলে কী?

৩.৩ ‘আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একরকম ভবঘুরে সেল আছে।’—সেলটিকে ‘ভবঘুরে’ বলা হয়েছে কেন?

৩.৪ ‘নানা জাতের খরগোশের মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায়’ —কয়েকটি খরগোশের জাতির নাম লেখো।

৩.৫ ‘কোনো কোনো পতঙ্গ উড়বার সময় তাদের ডানা প্রচণ্ড জোরে নাড়ে’--- তোমার চেনা কয়েকটি পতঙ্গের নাম লেখো। তাদের ছবি সংগ্রহ করে খাতায় লাগাও।

৩.৬ ‘কত সামুদ্রিক জীব গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেয় তার হিসাব আমরা রাখি না’— কয়েকটি সামুদ্রিক জীবের নাম লেখো।

৩.৭ ‘রক্ষে এই যে......’ লেখক কোন বিষয়টিকে সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন এবং কেন?

৩.৮ প্যারামোসিয়াম কীভাবে চলাফেরা করে?

৩.৯ প্যারামোসিয়াম ছাড়া দুটি এককোষী জীবের নাম লেখো।

৩.১০ ‘তার চলাফেরার ভঙ্গিটি ভারি মজার’ —কার চলার ভঙ্গির কথা বলা হয়েছে? তা ‘মজার’ কীভাবে?

৩.১১ গমনে সক্ষম গাছ ও গমনে অক্ষম প্রাণীর নাম লেখো।

৩.১২ কয়েকটি ‘হক্’ জাতীয় পাখির নাম লেখো।

৩.১৩ আফ্রিকার কী জাতীয় পাখি ওড়া ছেড়ে হাঁটায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে?

৩.১৪ ক্রমবিকাশের পথ পরিক্রমায় ঘোড়ার আঙুলের কোন পরিবর্তন ঘটেছে?

৩.১৫ পাঠ্যাংশে রয়েছে এমন একটি নিশাচর প্রাণীর নাম লেখো।

৪. **টীকা লেখো :** হিউয়েন সাঙ, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, ভাস্কো-ডা-গামা, শঙ্করাচার্য।

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৫.১ প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয়—গাছ কীভাবে না দৌড়ে তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে?

৫.২ প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন যে খাবার সংগ্রহের কারণেই ‘প্রাণীরা এক জায়গায় স্থাণু না হয়ে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে’।— তুমি কি এই মতটিকে সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৫.৩ ‘গমনাগমনের প্রকৃত মাধুর্যটা আমাদের চেখে পড়ে সাধারণত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে’।— পাঠ্যাংশে উচ্চতর প্রাণীদের গমনাগমনের মাধুর্য কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করো।

৫.৪ ‘ এ পথে আমি যে গেছি’— রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গটি পাঠ্যাংশে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে?

৫.৫ ‘এরকম মনে করলে ভুল হবে।’—কোন দুটি বিষয়ের ভুল সাপেক্ষে এমন মন্তব্য করা হয়েছে?

৫.৬ উচ্চতর জীবদের পেশি কাজ করার ক্ষেত্রে কীভাবে শক্তি উৎপাদিত হয়?

৫.৭ ‘ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জানা যায়’ — এ প্রসঙ্গে লেখক কোন তথ্যের অবতারণা করেছেন?

৫.৮ ‘মনের দৌড়ে মানুষ চ্যাম্পিয়ন’ —এমন কয়েকজন মানুষের কথা লেখো যাদের শারীরিক অসুবিধা থাকলেও মনের দৌড়ে সত্যিই তাঁরা প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছেন।

৫.৯ ‘মানুষ এখন শুধু নিজে চলেই ক্ষান্ত নয়।’ —নিজের চলা ছাড়া বর্তমানে মানুষ কী কী জিনিস চালাতে সক্ষম?

৫.১০ ‘এখন মানুষ আকাশটাকে নতুন করে ঘোড়াদৌড়ের মাঠ করে তুলেছে।’ ---মানুষের মহাকাশ-অভিযানের সাম্প্রতিকতম সাফল্য নিয়ে প্রিয় বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো।

৫.১১‘এ যাত্রা তোমার থামাও’ —লেখক কাকে একথা বলেছেন? এর কোন উত্তর তিনি কীভাবে পেয়েছেন?

শিবতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬ - ১৯৯৩) : বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং প্রাণিবিজ্ঞানী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আমেরিকার রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। জীববিদ্যার উন্নয়নমূলক গবেষণার জন্য জুলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে পেয়েছেন অসংখ্য স্বীকৃতি ও সম্মান। স্যার দোরাবজি টাটা স্বর্ণপদক, জয়গোবিন্দ স্বর্ণপদক প্রভৃতি এর মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানভিত্তিক জনপ্রিয় লেখালেখিতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘অণুর উত্তরায়ণ’, ‘লাবণ্যের অ্যানাটমি’, ‘দিক্‌বিদিক’, ‘মানহাটান ও মার্টিনি’, ‘আসা যাওয়ার পথের ধারে’ প্রভৃতি।

নোট বই

সুকুমার রায়

এই দেখো পেনসিল, নোটবুক এ হাতে,
এই দেখো ভরা সব কিলবিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট পট লিখি তায়—
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কী কী খায়;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চটচট,
কাতুকুতু দিলে গোরু কেন করে ছটফট।
দেখে শিখে পড়ে শুনে বসে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট কট ফোড়া করে টন টন—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পটকা?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কামড়ায়, বলো দেখি পারো কে?
বলো দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বলবে কী, তোমরাও নোট বই পড়োনি!

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ নোট বই কী ধরনের লেখাতে ভরা?

১.২ বক্তা কী করে নিজে নিজে নোট বইটি লিখলেন?

২. চটপট, চটচট, ছটফট, কটকট — এই শব্দগুলি কী ধরনের শব্দ? চটপট আর ছটফট এই দুটি শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লেখো।

৩. নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :

______লণ্ঠন, ______লংকা, ______আঠা।

৪. একই অর্থযুক্ত আরেকটি শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

পা, উত্তর, অস্থিরতার ভাব, তীক্ষ্ণতা।

শব্দার্থ : চটপট — তাড়াতাড়ি/দ্রুত। ঠ্যাং—পা। চটচট —আঠালো। ছটফট—অস্থিরতার ভাব। খটকা—সন্দেহ। পিলে— প্লীহা। দুন্দুভি—ঢাক। অরণি—যে কাঠে আগুন জ্বলে বা চকমকি পাথর বা চিত্রক গাছ।

৫. শূন্যস্থান পূরণ করো :

বিশেষ্য	বিশেষণ
আঠা	__________
__________	মানসিক

৬. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৬.১ 'ভালো কথা শুনি যেই চটপট লিখি তায়'—বক্তা কোন কোন ভালো কথা নোট বইয়ে লিখে রেখেছিলেন?

৬.২ 'কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা'—কাল থেকে মনে কী খটকা লেগেছে? এই খটকা কীভাবে দূর হবে?

৬.৩ 'বলবে কী, তোমরাও নোটবই পড়োনি!'—নোটবই পড়লে আর কী কী জানা যাবে?

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩): 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' ইত্যাদির স্রষ্টা সুকুমার রায়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রত্যেক বাঙালির শৈশবে জড়িয়ে আছেন এই কবি ও সাহিত্যিক। চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, সরস ও কৌতুককর কাহিনি এবং ছড়া রচনায় সুকুমার রায় অতুলনীয়। তাঁর রচিত অন্যান্য বই— 'খাই খাই', ' অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি। স্বল্পদিনের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা থেকে বাঙালি জাতি চিরদিন অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাবে।

৭. নির্দেশ অনুসারে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৭.১ ভালো কোনো কথা শুনলে কবিতার লোকটি কী করে?

৭.২ তার শোনা কয়েকটি ভালো কথার নমুনা কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

৭.৩ কিলবিল, ছটফট, কটকট, টনটন এগুলো কী ধরনের শব্দ?

৭.৪ 'মাথাঘামানো' এই বিশিষ্টার্থক শব্দবন্ধের অর্থ কী?

৭.৫ ভালো কোনো প্রশ্ন মনে এলে বক্তা কার সাহায্য নিয়ে সেগুলির উত্তর জেনে নেন?

৭.৬ মানুষের কাছে নোট বই থাকাকে কি তুমি জরুরি বলে মনে করো?

৭.৭ তুমি যদি নোট বই কাছে রাখো তাতে কী ধরনের তথ্য লিখে রাখবে?

৭.৮ 'জোয়ান' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে আলাদা বাক্য লেখো।

৭.৯ 'আগাগোড়া' এমন বিপরীতার্থক শব্দের সমাবেশে তৈরি পাঁচটি শব্দ লেখো।

৭.১০ কবিতাটিতে কোন কোন পতঙ্গের উল্লেখ রয়েছে?

৭.১১ কবিতায় উত্থাপিত কোন কোন প্রশ্নের উত্তর তুমি জানো?

৭.১২ কোন প্রশ্নগুলি পড়ে কবিতাটিকে তোমার কবির খেয়ালি মনের কল্পনা বলে মনে হয়েছে?

৮. নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো :

তায়, মোর, তেজপাতে।

৯. বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে আর বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :

মন, চটচট, জবাব, পেট।

১০. নীচের সর্বনামগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করো :

আমি, মোর, কে, কার, কাকে, তোমরা, নিজে।

১১. নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুই অংশ সম্প্রসারণ করে লেখো :

১১.১ ওরে রামা ছুটে আয় নিয়ে আয় লণ্ঠন।

১১.২ এই দেখো ভরা সব কিলবিল লেখাতে।

১১.৩ জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।

১১.৪ ঝাল কেন লংকায়।

১১.৫ বলবে কী, তোমরাও নোট বই পড়োনি!

১২. নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

১২.১ <u>কাল থেকে</u> মনে মোর লেগে আছে খটকা।

১২.২ ওরে <u>রামা</u> ছুটে আয়।

১২.৩ <u>পেট</u> কেন কামড়ায় বলো দেখি পারো কে?

১২.৪ নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি <u>আমি</u> এ।

১২.৫ <u>এই বেলা</u> প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে।

মেঘ-চোর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পুরন্দর চৌধুরি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, 'অসীমা, এবার আমি তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাব, যা তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। এরকম দৃশ্য কেউ কল্পনাও করেনি।'

ছোটো একটা রকেট আকাশের এক জায়গায় গোল হয়ে পাক খাচ্ছে। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কম্পিউটারই রকেটটাকে ঘোরাচ্ছে।

দুটিমাত্র আসন। পাশাপাশি বসে আছেন পুরন্দর ও অসীমা। পুরন্দরের মুখখানা ফরসা ও একেবারে গোল, প্রায় চাঁদের মতন, তাঁর চোখের মণি দুটো নীল। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃষ্টিবিজ্ঞানী হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম। সাহারা মরুভূমিতে এক মাসে একশো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড

করেছেন। এ-জন্য তাঁর প্রশংসা যত হয়েছে, নিন্দেও হয়েছে প্রায় ততটাই।

মেঘ থেকে ইচ্ছেমতন বৃষ্টিপাত ঘটানো এখন আর নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি অন্য দেশ থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে সাহারায় বৃষ্টি ঝরিয়েছেন। সেই দেশে এবার বৃষ্টি কম হবে। একে মেঘ-চুরি বলা যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনেকগুলি দেশ দাবি তুলেছে যে, মেঘ-চুরি আইন করে বদলানো দরকার।

অসীমার বয়েস সাতাশ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে। পুরন্দর চৌধুরি বোস্টন শহরে আবহাওয়ার বিষয়ে একটি আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে অসীমার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ আলাপ হয়। অসীমা নিজেই পুরন্দর চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

সেই আলোচনা-সভায় কারপভ নামে একজন বিজ্ঞানী পুরন্দরকে মেঘ-চোর বলে গালাগাল দেওয়ায় তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, চিৎকার করে কিছু বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই দুনিয়ায় পুরন্দর চৌধুরির আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি বিয়েও করেননি। বিদেশে একটি অচেনা বাঙালি মেয়েকে তাঁর সেবা করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কে?'

অসীমা বলেছিল, 'আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনার ছোটো ভাইয়ের মেয়ে।'

পুরন্দর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তাঁর একটি ভাই ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আগে। সেই ভাইয়ের নাম ছিল দিক্‌বিজয়।

অসীমা বলেছিল, 'আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাননি, তিনি দেশ ছেড়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আলাস্কায় এসে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। তিনিই আমার মা। আমার বাবা আপনাকে খুব ভালোবাসতেন, মৃত্যুর আগেও আপনার কথা বলেছিলেন।'

বিদেশে এসে এমনভাবে একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে খুঁজে পেয়ে পুরন্দর চৌধুরি দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তিনি আর অসীমাকে ছাড়তে চাননি। তাঁর নিজস্ব রকেটে তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আবহাওয়ার নানারকম রহস্য দেখাচ্ছেন।

ঘুরতে-ঘুরতে এখন ওঁরা এসেছেন আলাস্কার আকাশে। অসীমা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যেখানে থাকত, সে-জায়গাটাও দেখা হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য এস্কিমোদের ইগলুর বদলে এখন বড়ো-বড়ো এয়ারকন্ডিশানড্ বাড়ি উঠেছে। পুরন্দর চৌধুরি বললেন, 'নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, ওটা কী দেখছ বলতে পারো?'

অসীমা বলল 'দেখতে পাচ্ছি একটা সোনালি রঙের পাহাড়। চূড়ার বরফের ওপর রোদ পড়েছে বলে সত্যিই সোনার মতন ঝকঝক করছে।'

'ওই পাহাড়টার নাম জানো?'

অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও ভূগোলও বেশ ভালোই জানে। সে বলল, 'আমি আলাস্কার এত দূরে কখনও আসিনি বটে, তবে এই পাহাড়টার নাম মাউন্ট চেম্বারলিন। তার পাশেই যে কুয়াশায় ঢাকা হ্রদ, তার নাম লেক শ্রেভার।'

পুরন্দর খুশি হয়ে বললেন 'বাঃ! এবার তোমাকে আমি যা দেখাব, তা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে দারুণ হইচই হবে এই নিয়ে, কিন্তু তুমি মুখ খুলতে পারবে না। ব্যাটা কারপভ, কীরকম জব্দ হয় এবার দেখো।'

অসীমা মৃদুভাবে বলল, 'বিজ্ঞানীদের উচিত নয় কিন্তু একজন আর-একজনকে জব্দ করা।'

'বোকাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের জ্ঞান কতটুকু! আমাকে মেঘ-চোর বলে, এত সাহস? আমি অন্যায়টা কী করেছি? সাইবেরিয়া থেকে মেঘ এনেছি সাহারায়। সাইবেরিয়ায় অত বরফ, সেখানে বৃষ্টি না হলে ক্ষতি কী আছে?'

অসীমা বলল, 'কিন্তু একবার এ রকম শুরু করলে, তারপর যদি যে-কোনো দেশ অন্য দেশের মেঘ চুরি করতে শুরু করে? তখন সে-দেশের মানুষের কী অবস্থা হবে?'

'আমি পৃথিবীর মানুষকে আর-একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাব। যাতে ওরকম মেঘ চুরি হলেও কোনো ক্ষতি হবে না। যাকগে, সে-কথা পরে। তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, পৃথিবীতে শেষ তুষার-যুগ কবে এসেছিল জানো?'

'এটা ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তবু আমি এটা জানি। শেষ হিমযুগ শেষ হয়েছিল তেরো হাজার বছর আগে।'

'ঠিক বলেছ। এই লেক শ্রেভার তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। মাউন্ট চেম্বারলিনের বরফগলা জল এই লেকে এসে জমে। আবার এই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মাউন্ট চেম্বারলিনের চূড়ায় গিয়ে আবার বরফ হয়ে যায়। এই সাইক্‌ল চলছে'।

'যেমন সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে উড়ে যায়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্র ভরাট হয়।'

'ওটা তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মতন হলো। আসল বৃষ্টির হিসেবটা তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারা বছর পৃথিবী থেকে কত জল বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায় জানো? পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল। তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে। আবার ঠিক আশি হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে ফিরে আসে। আর মাত্র পনেরো হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সব বেঁচে আছে। প্রকৃতির হলো এটাই নিখুঁত হিসেব। কিন্তু এবার মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের জন্যে বেশি বৃষ্টি দরকার।'

'আপনি এখানে আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন?'

‘হ্যাঁ। এই যে নীচে দেখছ লেক শ্রেভার, এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। এখানে যতখানি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে, ঠিক ততখানি বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে না। কিছুটা কম ফিরে আসছে। অর্থাৎ হ্রদটা একটু-একটু করে শুকোচ্ছে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই হ্রদটা পুরোপুরি শুকোতে আরও দশ হাজার বছর লাগবে।’

‘আপনি কী করে জানলেন? ঠিক দশ হাজার বছর লাগবে?’

‘অঙ্কের হিসেবে! তুমি পৃথিবীর যে-কোনো পাহাড়, নদী, পুকুর, খাল-বিলের কাছে আমায় নিয়ে যাও, আমি অঙ্ক কষে বলে দেবো, সেখান থেকে কত জল বাষ্প হচ্ছে আর কত জল বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে। এই অঙ্ক আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। কারপভও কিছুটা জানে,তবে আমার চেয়ে কম।’

‘আমি তো ইতিহাস পড়ি, অঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না।’

‘ইতিহাসেও তো অঙ্ক লাগে। অবশ্য সাধারণ যোগ-বিয়োগ। আচ্ছা ইতিহাসের ছাত্রী, তুমি আটলান্টিস নামে লুপ্ত সভ্যতার কথা জানো? সেটা কোথায় ছিল বলো তো?’

‘এটাও কিন্তু ইতিহাসের বিষয় নয়। আটলান্টিসের ব্যাপারটা গ্রিক লেখকদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হয়েছে, এখনও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ঠিকঠাক।’

‘আমি যদি বলি এই লেক শ্রেভারের তলাতেই চাপা পড়ে আছে।’

‘সেটা দশ হাজার বছর পরে জানা যাবে!’

পুরন্দর চৌধুরি হা-হা করে হেসে উঠলেন। ছোট্ট একটা মশলার কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ খেয়ে বললেন, ‘তুমি একটা নেবে নাকি?’

অসীমা একটা লবঙ্গ নিল।

পুরন্দর চৌধুরী বললেন ‘তুমি আর আমি কেউই তো দশ হাজার বছর বাঁচব না! ততদিনে পৃথিবীতে মানুষই থাকবে কিনা সন্দেহ! দশ হাজার বছর তো দূরের কথা, আমি দশ বছরও অপেক্ষা করতে রাজি নই।’

অসীমা চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, ‘তা হলে কি আপনি এই লেকটা খুঁজে দেখতে চান? এর তো প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা!’

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললেন, ‘খোঁড়াখুঁড়ি তো তোমাদের কাজ। আমি জল নিয়ে কারবার করি। জল কি খুঁড়তে হয়? এই যে এতবড়ো একটা লেক পড়ে আছে এখানে, এটা অপ্রয়োজনীয়, তাই না? কোনো মানুষ এখানে আসে না। দশ হাজার বছর ধরে লেকটা নিজে-নিজে শুকোতই— অতদিন অপেক্ষা না করে এখনই এটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয়?’

‘এতবড়ো লেকটা শুকোবেন কী করে? সেই জল ফেলবেন কোথায়?’

‘মেঘ করে ছড়িয়ে দেব। সেই মেঘ কারপভের দেশে পাঠিয়ে দেবো। ও খুব মেঘ-মেঘ বলে চ্যাঁচামেচি

করছিল যে'!

'এই বিশাল হ্রদের জল যদি মেঘ হয়ে যায়, সেই মেঘ থেকে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হবে। একসঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেলে পৃথিবীর দারুণ কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না!'

'কী আর হবে! সাইবেরিয়ায় বড়োজোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমবে!'

অসীমা হেসে ফেলে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতবড়ো লেক কি শুকিয়ে ফেলা যায়?'

পুরন্দর বললেন, 'বড়ো-বড়ো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন প্রথম হয়, তখন সবাই অবিশ্বাস করে। তোমাকে আর-একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। ঘটনাটা ছোটো কিন্তু তার ফলটা হয়েছিল বিরাট। দশ লক্ষ বছরেরও কিছু বেশি আগে, এই পৃথিবীর উত্তাপ হঠাৎ একটু কমে গিয়েছিল। এ রকম হয়। পৃথিবীর উত্তাপ মাঝে-মাঝে কমে-বাড়ে। মাঝে-মাঝে—এই ধরো — দশ-পনেরো হাজার বছর পরে-পরে। আমি যেবারের কথা বলছি, সেবারে পৃথিবীর উত্তাপ কমেছিল মাত্র তিন থেকে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেলসিয়াসের হিসেবে খুব বেশি হলে দুই পয়েন্ট দুই। অতি সামান্য— তাতেই গোটা উত্তর আমেরিকাটা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। কোথাও-কোথাও বরফ জমে গিয়েছিল এক হাজার ফিট উঁচু। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য!'

অসীমা বলল, 'আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন? আমি ভাবছিলুম, আপনি আমাকে ছেলে-মানুষ ভেবে ঠাট্টা করছেন!'

'না, এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার বুঝলে তো, পৃথিবীর উত্তাপ একটুখানি কমে গেলেই কী কাণ্ড হয়? সেইরকম পৃথিবীর উত্তাপ যদি খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই সব বরফ গলতে শুরু করবে। আগে এই তাপ কমা-বাড়াটা সূর্যের ওপর নির্ভর করত। এখন মানুষই তা পারে। যেসব পাগলগুলো অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা জমিয়ে রেখেছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফাটাতে শুরু করে তা হলে পৃথিবীর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!'

'সে-কথা জানি! এতবড়ো লেকটাকে বাষ্প করে দেওয়ার জন্য আপনিও একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবেন নাকি?'

'আমি ওসব বোমা-টোমায় বিশ্বাস করি না! আমি পুরন্দর চৌধুরি, আমার আবিষ্কার সব সময় মৌলিক। আলাস্কার এই চেম্বারলিন পাহাড়ের কাছে জনমনুষ্য নেই। এখানেই হবে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা। শুধু তুমি থাকবে তার সাক্ষী। তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে তাই তোমাকে এই মহান দৃশ্য দেখার সুযোগ দিচ্ছি। দশ হাজার বছর পরে যে-হ্রদটা শুকিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেবো পাঁচ মিনিটে।'

'সত্যিই কি তা সম্ভব!'

'এক্ষুণি দেখতে পাবে!'

'এতবড়ো লেকটার জল বাষ্প হয়ে গেলে যে বিরাট মেঘ হবে, তার ধাক্কায় আমাদের রকেট টিকতে পারবে?'

‘আমরা মেঘলোকের অনেক উঁচুতে উঠে যাব! মেঘ আর কতটা উঠতে পারে!’

‘তারপর এতবড়ো মেঘকে আপনি সাইবেরিয়া পাঠাবেন?’

‘সবটা নাও পাঠাতে পারি, কিছু-কিছু বিক্রিও করতে পারি। যেসব দেশে বৃষ্টি কম, তাদের কয়েক টুকরো দেওয়া যেতে পারে।’

‘ততদিন আপনি এই মেঘ জমিয়ে রাখবেন কোথায়?’

‘উড়িয়ে নিয়ে বেড়াব। এক দেশ থেকে আর-এক দেশে উড়ে যাবে। যে-কোনো দেশের ওপর দিয়েই মেঘ উড়ে যাওয়া তো বেআইনি নয়!’

‘কিন্তু এই মেঘের সঙ্গে অন্য দেশের মেঘ উড়ে যেতে পারে না?’

‘তা পারে অবশ্য! জানো অসীমা, এতবড়ো একটা জলভরা মেঘ যদি আমাদের অধিকারে থাকে, তাহলে সেই মেঘখানাকে উড়িয়ে-উড়িয়ে আমরা পৃথিবীর সব মেঘ একসঙ্গে জুড়ে নিতে পারি। তখন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে, তা আমি ঠিক করছি। আমি হব আকাশের দেবতা ইন্দ্র। আমার নাম পুরন্দর, তার মানে জানো তো? যে-ক'জন বিজ্ঞানী আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, আমার নামে নিন্দে রটিয়েছে, তাদের দেশে আমি ইচ্ছে করলে একফোঁটাও বৃষ্টি না দিতে পারি।

অসীমা হঠাৎ মুখ নিচু করে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দর একটু রেগে গিয়ে বললেন, ‘এখনও বুঝি তোমার সন্দেহ হচ্ছে!’

অসীমা বলল, ‘না, তা নয়। আপনি পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল আয়তনের এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন, আর সবক'টা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন, বৃষ্টি নেবে? বৃষ্টি নেবে? এটা ভাবতেই কীরকম মজা লাগছে।’

পুরন্দর বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মজারই ব্যাপার। আমি সত্যি-সত্যি অবশ্য সেরকম কিছু করব না। আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই। মানুষের ক্ষতি করতেও চাই না। শুধু ওই কারপভ আমাকে মেঘ-চোর বলেছে, ওর দেশে আমি এই প্রকাণ্ড মেঘটা পাঠিয়ে দিয়ে বলব, এই নাও ধার শোধ! সাইবেরিয়ায় কয়েক ইঞ্চি বরফ বেড়ে যাবে।’

অসীমা বলল, ‘কিন্তু সাইবেরিয়ায় যাওয়ার আগেই যদি এই মেঘ কোথাও ভেঙে পড়ে! কোনো দেশকে ভাসিয়ে দেয়?’

পুরন্দর বললেন, ‘সে রকম একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই মেঘের চরিত্র কী হবে তা বলা যায় না। তবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় এ রকম একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। অবশ্য আমার যতদূর ধারণা, আমি মেঘটাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব!’

‘মনে করুন, সাইবেরিয়ার দিকে না গিয়ে এই মেঘটা আপনার দেশ কলকাতার আকাশের ওপর ভেঙে পড়ল, তা হলে সেই শহরের অবস্থা কী হবে?’

‘এ রকম জলভরা টলটলে মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়লে কলকাতার অর্ধেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম অবস্থা আমি হতেই দেবো না। মেঘটা এদিক-ওদিক গেলেই আমি ফাটিয়ে দেবো কোনো নির্জন জায়গায়।’

এবারে তিনি নিচু হয়ে তাঁর বসবার জায়গার তলা থেকে একটি ফাইবার গ্লাসের বাক্স বার করলেন। সেই বাক্সের মধ্যে ফুটবলের সাইজের একটা ধাতুর বল।

সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, ‘এটা দেখছ, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়। এর গুণ হচ্ছে জলের ছোঁয়া লাগলেই এটা গরম হতে শুরু করে। তারপর উত্তাপ এমন বাড়বে যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দ্যাখো, বাতাসে যে জলকণা আছে, তাতেই এটা গরম হতে শুরু করেছে। সেইজন্যেই এটাকে এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে হয়।’

অসীমা হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই বলটা বেশ গরম।

পুরন্দর বললেন, ‘আমার হিসেব অনুযায়ী জলের মধ্যে মেশবার পর পাঁচ মিনিটেই এর উত্তাপ এত বাড়বে যে, গোটা লেকটারই বরফ গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে। তারপর আমরা দেখব ওর তলায় আটলান্টিস আছে কি না। দু’রকম আবিষ্কারই হবে, কী বলো!’

অসীমা জিজ্ঞেস করল, ‘আমরা মেঘলোকের ওপরে উঠে গেলে মেঘের তলায় কী আছে তা দেখব কী করে?’

‘দেখতে পেলে তো হলো!’

‘আপনার এই গোল ধাতুটা কি একবার গরম হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে?’

‘না, না, না এর ধ্বংস নেই। এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে। সব জল শুকিয়ে গেলেই এটা আস্তে আস্তে আবার ঠান্ডা হতে শুরু করবে। এইবার তা হলে শুরু হোক।’

অসীমা তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলভার বার করে বলল, ‘পুরন্দর চৌধুরী, ওই বলটাকে আপনি এবার ওই এয়ার-টাইট বাক্সে ঢোকান। এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে।’

দারুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে পুরন্দর বললেন, ‘ এ কী অসীমা! তুমি ওটা তুলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?’

অসীমা বলল, ‘আপনার দিকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না হলে আপনি আমার কথা শুনতেন না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ। আলাস্কার একটি লেক শুকিয়ে সাইবেরিয়ায় এতবড়ো একটা মেঘ পাঠালে প্রকৃতিতে মহাবিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে। ড. কারপভের ওপর রাগ করে আপনি পৃথিবীর ক্ষতি

করতে চাইছেন!'

পুরন্দর চৌধুরি বললেন, ওটা সরিয়ে রাখো! পাঁচ মিনিটে এতবড়ো একটা মেঘ সৃষ্টি করার রেকর্ড করব আমি। তার সঙ্গে তোমার নামটাও থাকবে আমার ভাইঝি হিসেবে।'

'আমি আপনার ভাইঝি নই। আমি কারপভের মেয়ে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আমার মা বাঙালি মেয়ে।'

'তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে? তুমি একটা স্পাই।'

'ঠিক মিথ্যা বলিনি। আমার বাবা আপনাকে বড়োভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আপনি এক দেশের মেঘ অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে পাগলামি করছেন। সমুদ্র থেকে খাল কেটে সাহারায় জল আনা হচ্ছে, অন্য দেশের মেঘ আনার দরকার নেই।'

'তুমি, তুমি আমার এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি আমার ওপর গুলি চালাও, আমাকে মেরে ফ্যালো, তবু এই গোলাটা আমি হ্রদে ফেলবই। আমি মরে গেলেও পৃথিবীর লোক জানবে যে পুরন্দর চৌধুরি কতবড়ো বিজ্ঞানী ছিল।'

অসীমা একবার বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে পুরন্দরের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইল।

পুরন্দর রকেটের একটা অংশ খুলতে যেতেই অসীমা বলল, 'ওটা খুলবেন না। তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব।'

'আমি এটা বাইরে ছুঁড়বই!'

'ছুড়ুন তাহলে। কিন্তু জানালা-টানালা খুলবেন না। এই সকেটের মধ্যে ফেলুন, নীচের পরপর কয়েকটা ভাল্‌ভ খুলে গিয়ে এটাকে বাইরে বার করে দেবে।'

'তার মানে! তুমি কী বলছ? জানালা খুলব না কেন?'

'ডক্টর পুরন্দর চৌধুরি, আপনি আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। আমি কিন্তু শুধু ইতিহাসের ছাত্রী নই, কম্পিউটারেও আমার বিশেষ আগ্রহ। আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখেছিলাম। কম্পিউটার এখন রকেটটাকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে। লেকটাকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার বলটা ছুঁড়লেও লেকে পড়বে না। বলটা আস্তে-আস্তে ঠান্ডা হয়ে আসছে না?'

পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সেই সুন্দর চেহারার মেয়েটার মাথায় এতসব বুদ্ধি! বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাঁর অ্যালয়টা অকেজো!

অসীমা বলটা পুরন্দরের হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল সকেটে। তারপর বলল, 'ওটা মহাশূন্যেই থাক। তাহলে কোনোদিন আর জলের ছোঁয়া পাবে না। পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমনই থাকুক!'

টীকা:

সাহারা মরুভূমি: আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় গোটা উত্তরাংশ জোড়া ৯,৪০০,০০০ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। আলজিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, মালি, সুদান, তিউনিশিয়া সহ মোট বারোটি দেশ জুড়ে এই মরুভূমি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ : ১৯৪৫-এ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিকাশ, মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তির লক্ষে প্রতিষ্ঠিত। মূল কার্যালয় নিউইয়র্ক, আমেরিকা। সদস্য দেশ ১৯৩।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় : আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স এ অবস্থিত, ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

বোস্টন: ম্যাসাচুসেটসের রাজধানী।

আলাস্কা: আমেরিকার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম প্রদেশ। এর উত্তরে সুমেরু মহাসাগর, পূর্বে কানাডা এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিক জুড়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগর।

এস্কিমো: পূর্ব সাইবেরিয়া, আলাস্কা, কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড জুড়ে বসবাসকারী জনজাতি। এদের প্রধান দুটি ভাগ হলো ইউপিক এবং ইনুইট।

ইগলু: এস্কিমোদের তৈরি বরফের বাড়ি। বরফ বায়ু নিরোধক বলে ইগলুর ভেতরের উষ্ণতা বাইরের প্রকৃতির থেকে অনেক বেশি থাকে।

মাউন্ট চেম্বারলিন: আলাস্কার ব্রুকস পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতা ২৭৪৯ মিটার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪—২০১২) : জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ‘আত্মপ্রকাশ’ তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস, আর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য। ছোটোদের মহলেও সমান জনপ্রিয় তিনি। প্রথম কিশোর-উপন্যাস ‘ভয়ংকর সুন্দর’। ‘নীললোহিত’ ছদ্মনাম ছাড়াও ‘সনাতন পাঠক’ ও ‘নীল উপাধ্যায়’ নামে অনেক লেখা লিখেছেন। ‘আনন্দ পুরস্কার’, ‘বঙ্কিম পুরস্কার’, ‘সাহিত্য আকাদেমি’ ইত্যাদি নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্রথম আলো’, ‘সেই সময়’, ‘পূর্ব পশ্চিম’, ‘মনের মানুষ’, ‘অর্জুন’, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’। গ্রন্থ সংখ্যা দুশোর বেশি। তাঁর লেখাগুলি চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

১. **সন্ধি করো:**

বৃষ+তি	অপ+ইক্ষা
গো+এষণা	পরি+ঈক্ষা
আবিঃ+কার	কিম্‌+তু

২. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:**

নিরুদ্দেশ, বিয়োগ, উত্তাপ, নির্জন, যুগান্ত।

শব্দার্থ : রকেট—পৃথিবীর অভিকর্ষের টান ছাড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়ার দ্রুতগামী যান। কম্পিউটার—যন্ত্রগণক। পুরন্দর—ইন্দ্র। দিক্‌বিজয়—সর্বদিক বা নানাদেশ জয়। তুষারযুগ—হিমযুগ। যুগান্তকারি—নতুন যুগ শুরু করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এয়ারকন্ডিশানড্‌— শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বাতানুকূল। প্রাগৈতিহাসিক—যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা গেছে তার পূববর্তী যুগের। নিশ্চিহ্ন—অদৃশ্য, উধাও। মার্কারি—পারদ। অ্যালয়—ধাতু সঙ্কর। এয়ারটাইট—বায়ুনিরোধক। স্পাই—চর, গোয়েন্দা। সকেট—কোটর। অকেজো—অকর্মণ্য, অব্যবহার্য।

৩. **নীচের শব্দগুলিতে ব্যবহৃত নঞর্থক উপসর্গগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো।**

উপসর্গ	যেমন	নতুন তৈরি শব্দ
অ	অচেনা	
নি	নিখুঁত	
বি	বিদেশ	
নিঃ	নিশ্চিহ্ন	
বে	বেবন্দোবস্ত	

৪. **নঞর্থক উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গের ব্যবহারে তৈরি শব্দও এই গল্পে কম নেই। এখানে সেই ধরনের একটি করে শব্দ দিয়ে দেওয়া হলো, প্রতিটি উপসর্গ দিয়ে তৈরি আরো পাঁচটি করে শব্দ লিখতে হবে তোমাকে।**

উপসর্গ	যেমন	নতুন তৈরি শব্দ
প্র	প্রশংসা	
আ	আলাপ	
বি	বিজ্ঞানী	
প্রাক্‌	প্রাগৈতিহাসিক	
সম্‌	সংক্ষেপ	
অধি	অধিকার	

৫. **“অসীমা বলল, না তা নয়,... এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন” আর... “আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই...” উদ্ধৃতাংশটিতে ‘ফেরিওয়ালা’ আর ‘ব্যবসাদার’ শব্দ দুটি পাচ্ছি। এই ‘ওয়ালা’ এবং ‘দার’ অনুসর্গ দুটি ব্যবহার করে অন্তত পাঁচটি করে নতুন শব্দ বানাও।**

ওয়ালা—

দার—

৬. **এই গল্পটিতে অজস্র শব্দ দ্বৈত ব্যবহৃত হয়েছে। কোনটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বুঝে নিয়ে অথবা গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের খোপগুলিতে শব্দবাক্স থেকে শব্দ নিয়ে সঠিকস্থানে বসাও। একটি করে উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হলো :**

দ্বিরুক্তি-অর্থে	উড়িয়ে উড়িয়ে
ঈষদর্থে/ সাদৃশ্য-অর্থে	মেঘ-মেঘ
প্রকৃত শব্দ+বিকৃত শব্দে	হইহই
সমার্থক শব্দযুগ্ম	আত্মীয় স্বজন,
বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম	যোগ-বিয়োগ,
ধ্বন্যাত্মক/অনুকারাত্মক	হা-হা

খালবিল, গাছপালা, হইচই, ঠিকঠাক, আত্মীয়স্বজন, জল্পনা-কল্পনা, খোঁড়াখুঁড়ি, ঝকঝক, জীবজন্তু, একটু একটু, হা-হা, যোগ বিয়োগ, খোঁজাখুঁজি, নিজে নিজে, মেঘ-মেঘ, চ্যাঁচামেচি, মাঝে মাঝে, কমে বাড়ে, পরে পরে, কোথাও কোথাও, বোমা-টোমা, কিছু কিছু, উড়িয়ে উড়িয়ে, মুচকি মুচকি, সত্যি সত্যি, টলটলে, এদিক ওদিক, জানলাটানলা।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো:**

জব্দ, নিরুদ্দেশ, কারবার, লুপ্ত, নিখুঁত, কৃত্রিম, ধ্বংস, শ্রদ্ধা, অনুগ্রহ, স্থির।

৮. **নীচের শব্দগুলির দুটি করে পৃথক অর্থ জানিয়ে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা বাক্য লেখো:**

কাণ্ড, বল, যোগ, আলাপ, ব্যাপার, অঙ্ক, পর, ধার, চেয়ে, জন

৯. **সমোচ্চারিত/প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দগুলির অর্থ লিখে আলাদা আলাদা বাক্যরচনা করো:**

চাপা	যোগ	লক্ষ	দেশ	চুরি	কাটা
চাঁপা	যুগ	লক্ষ্য	দ্বেষ	চুড়ি	কাঁটা

১০. **স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১০.১ আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে **সে** ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে।

১০.২ অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও **ভূগোলও** বেশ ভালই জানে।

১০.৩ তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় **সমুদ্র থেকে।**

১০.৪ **সাইবেরিয়ায়** বড়জোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমে।

১০.৫ তাঁর নিজস্ব **রকেটে** তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় বেড়াচ্ছেন।

১১. একটি দুটি বাক্যে উত্তর দাও:

১১.১ ‘মেঘ-চোর’-এর মতো তোমার পড়া দু-একটি কল্পবিজ্ঞানের গল্পের নাম বলো।

১১.২ এই গল্পে কজন চরিত্র? তাদের নাম কী?

১১.৩ ‘মেঘ-চোর’ কাকে বলা হয়েছে?

১১.৪ পুরন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১.৫ অসীমা সম্বন্ধে দু-একটি বাক্য লেখো।

১১.৬ পুরন্দর কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন?

১১.৭ রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিভিন্ন দেশ কী দাবি তুলেছে?

১১.৮ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?

১১.৯ পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল কেন?

১১.১০ জ্ঞান ফিরে পুরন্দর অবাক হয়েছিলেন কেন?

১১.১১ দিক্‌বিজয় কে ছিলেন?

১১.১২ গল্পের ঘটনা যখন ঘটেছে তখন চরিত্রগুলি কোথায় ছিল?

১১.১৩ ইগলু-র পরিবর্তে সেখানে তখন কী দেখা যাচ্ছিল?

১১.১৪ কেন বলা হয়েছে অসীমা ‘ভূগোলও বেশ ভালো জানে’?

১১.১৫ কে কোথা থেকে কোথায় মেঘ এনেছিল?

১১.১৬ তুষার যুগ কাকে বলে?

১১.১৭ পৃথিবী থেকে কত জল সারাবছর বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায়?

১১.১৮ মানুষের জন্য বেশি বৃষ্টি দরকার কেন?

১১.১৯ আটলান্টিস কী?

১১.২০ পুরন্দরের মতে আটলন্টিসের অবস্থান কোথায়?

১১.২১ সাইবেরিয়া কোথায়?

১১.২২ অসীমা কেন পুরন্দরকে ফেরিওয়ালা বলে ব্যঙ্গ করেছে?

১১.২৩ অ্যালয় কী?

১১.২৪ পুরন্দরের তৈরি গোলকটিতে আছে এমন কোন ধাতুর নাম গল্পে পেলে?

১১.২৫ পুরন্দরের তৈরি গোলকটি এয়ারটাইট রাখতে হয় কেন?

১১.২৬ ‘‘প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ’’— কে, কাকে, কখন বলেছে?

১১.২৭ অসীমার প্রকৃত পরিচয় কী?

১১.২৮ ‘‘তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব’’— কে, কাকে, কেন বলেছে?

১১.২৯ অসীমার বিশেষ আগ্রহ কোন বিষয়ে?

১১.৩০ ‘পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমনই থাকুক’ —কে কখন এই কথা বলেছে?

১২. আট দশটি বাক্যে উত্তর দাও:

১২.১ এই গল্পে কাকে কেন ‘মেঘ-চোর’ বলা হয়েছে? তার মেঘ চুরির কৌশলটি সংক্ষেপে লেখো।

১২.২ ‘‘বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে অমিত বল, কিন্তু অযোগ্য মানুষের হাতে সেই ক্ষমতা হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী’’— পঠিত গল্পটি অবলম্বনে উপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করো।

১২.৩ পুরন্দর চৌধুরির চরিত্রটি তোমার কেমন বলে মনে হয়েছে— বিশ্লেষণ করো।

১২.৪ গল্পটি অবলম্বনে অসীমা চরিত্রটি সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাও।

১২.৫ এই গল্পে পুরন্দর এবং অসীমা আসলে দুটি পৃথক এবং পরস্পরবিরোধী বিজ্ঞান চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কে, কোন ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন জানিয়ে তুমি এঁদের মধ্যে কাকে কেন সমর্থন করো বিশদে জানাও।

১২.৬ গল্পটিতে যতগুলি স্থাননাম আছে তার একটি তালিকা বানিয়ে প্রত্যেকটি স্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।

দুটি গানের জন্মকথা

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

প্রথম গাওয়া হয়: ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১ কলকাতায়

গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কবে ও কোথায় রচিত তাও জানা যায় না। 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এই গানটি প্রথম জনসমক্ষে গাওয়া হয় সমবেতকণ্ঠে, ২৭ ডিসেম্বর। গানের রিহার্সাল হয়েছিল ডা: নীলরতন সরকারের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরেরদিন 'দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা' গানটির ইংরেজি অনুবাদ সহ সংবাদটি পরিবেশন করে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (মাঘ ১৩১৮) প্রথম প্রকাশিত গানটির পরিচয় দেওয়া হয় ব্রহ্মসংগীত বলে এবং এবছরের মাঘোৎসবেও গানটি ব্রহ্মসংগীত বলে গীত হয়।

গানটিকে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথের বিরোধীগণ প্রচার করেন, গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনকে উপলক্ষ করে রচিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটি রচনার উপলক্ষ জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলে তিনি তাঁকে লিখেছিলেন (২০ নভেম্বর ১৯৩৭):

"...সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।..."

গানটি নিয়ে নানারূপ সাময়িক তিক্ততা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও রবীন্দ্রনাথ গানটিকে পরেও নানা উপলক্ষে ব্যবহার করেছেন। যেমন, দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন মদনপল্লী—সেখানকার 'থিয়সফিক্যাল কলেজ' এর অধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু জেমস এইচ.কাজিন্স্ তাঁর সম্মানে এক সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'জনগণমন', এবং এর নামকরণ করেন 'The Morning Song of India'। সেই গানের সুর এবং অর্থগৌরব কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভূত করেছিল— সেই গানটিই প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনের অ্যাসেম্বলি সং বা বৈতালিকরূপে চলিত হয়ে যায়।

এর ১১ বছর পরে, ১৯৩০-র সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ জেনিভা থেকে গেলেন সোভিয়েট রাশিয়া। মস্কোয় 'পায়োনিয়ার্স কমিউন'এ অনাথ বালক বালিকারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর তারা কবিকে গান গাইতে অনুরোধ করতে, তিনি তাদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন 'জনগণমন'।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥
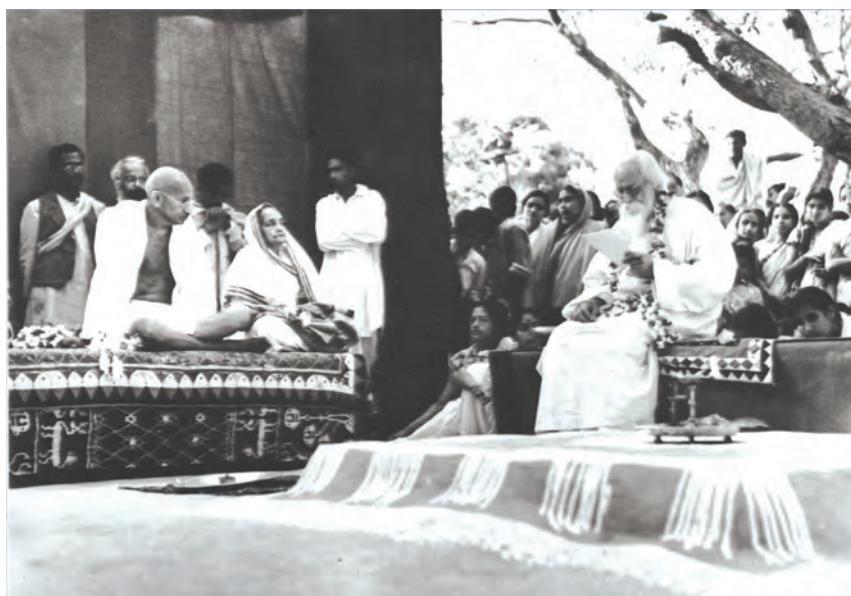
প্রথম গাওয়া হয়: ২৫ আগস্ট ১৯০৫

সরলা দেবী লিখেছেন তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য়:

...কর্তাদাদামহাশয় চুঁচুড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত——তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম——অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ...', ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে...', ' আমার সোনার বাংলা...' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।...

প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখটি জানতে পারার তাৎক্ষণিক আবেগে গানটি রচিত হয় ও ভক্তদের সূত্রে সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে গিরিডিতে। এখানে বসে তিনি ২২/২৩ টি গান রচনা করলেন, যেগুলি আজ স্বদেশি গান নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানগুলি সেসময় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপিত হলে গানটির এই প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি সেখানকার জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা : গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ / সমীর সেনগুপ্ত

১. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

১.১ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতটি কোন উপলক্ষে প্রথম গাওয়া হয়েছিল?

১.২ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতটির কোন পরিচয় দেওয়া হয়েছিল?

১.৩ রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন'র যে ইংরাজি নামকরণ করেন সেটি লেখো।

১.৪ ভারতবর্ষের জাতীয় মন্ত্রটি কী? সেটি কার রচনা?

১.৫ জাতীয় মন্ত্রের প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি শিক্ষকের থেকে জেনে খাতায় লেখো।

২. **টীকা লেখো :** জাতীয় সংগীত, মাঘোৎসব, বিশ্বভারতী, পুলিনবিহারী সেন, ডা. নীলরতন সরকার।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১ 'জনগণমন'কে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করতে বিরোধিতা হয়েছিল কেন? রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় সেই বিরোধিতার অবসান কীভাবে ঘটেছিল?

৩.২ 'রবীন্দ্রনাথ গানটিকে পরেও নানা উপলক্ষে ব্যবহার করেছেন।'— ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে এই গানটি ব্যবহার করেন?

কাজী নজরুলের গান

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

একদিন ঘটেছিলো একটি ঘটনা। যাচ্ছি ইস্কুলে। যত এগোচ্ছি, দেখছি হেদো পার্কের কাছে বেশ ভিড়। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম একে-ওকে। সবাই দেখলাম হেদোর কাছেই ভিড় জমাচ্ছে। কেউ একজন বললেন, জানো না খোকা, আজ নেতাজি এখানে বক্তৃতা দিতে আসবেন। জায়গাটির নাম ছিল বিডন স্ট্রিটের কাছে সরকার বাগান। নেতাজি আসবেন শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। ইশকুলের দিকে আর গেলাম না। একটু পরে আবার রোল উঠল কাজী নজরুলও আসছেন। এই দুই প্রিয় মানুষকে এত কাছ থেকে দেখব কোনোদিন ভাবিনি। উত্তেজনায় আমি তখন টগবগ করছি। বেশ অনেকক্ষণ পর দেখলাম এক দেবদূত মঞ্চ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, অতীব সুপুরুষ সেই ব্যক্তিই কি নেতাজি, কাকে জিজ্ঞাসা করব? কে উত্তর দেবে? কারণ তখন মঞ্চে আরও একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, নেতাজি স্বয়ং তাঁকে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন। শুনলাম ইনি কাজী নজরুল ইসলাম। নেতাজির বক্তৃতার আগে নজরুলের গান হতেই হবে, এই ছিল তখনকার কোনো স্বদেশি মিটিং-এর রীতি। যাই হোক, একজন গাইলেন, আরেকজন বললেন। গায়ক যা

গান গাইলেন তা শুনতে শুনতে দেখলাম, সভা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম কাজীর গান কী জিনিস! মুখ ভর্তি পান নিয়ে গলায় বাঁধা হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে কাজী নজরুল গাইছেন—এ ছবি আমি পরেও দেখেছি। তবে জীবনের প্রথম দেখা যে কোনও ভালো জিনিসই মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাই আজও কাজীদার সেই গান চোখ বুজলেই যেন শুনতে পাই। গানের পরে বক্তা কী বক্তৃতা দিলেন, তা আজ এত বছর পরে মনে নেই। তবে আমি দেখলাম অত ছোটো বয়েসেই আমার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। আমার মধ্যে কী যে হলো কে জানে, দেখলাম আমি ছুটছি, রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে চলে এলাম। উত্তেজনাকে কমানোর জন্যে টেনে নিলাম আমার প্রিয় সঙ্গী তবলাকে। ডুবে গেলাম তবলার বোলে!

(অনুলিখন : সাহানা নাগচৌধুরী)

১. কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতীত কোন মনীষীর নাম পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

২. ‘এই ছিল তখনকার কোনো স্বদেশি মিটিং-এর রীতি।’ — কোন রীতির কথা এখানে বলা হয়েছে?

৩. পাঠ্যাংশে কার, কেমন দেহসৌষ্ঠবের পরিচয় ধরা পড়েছে?

৪. **টীকা লেখো :** কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বদেশি যুগ।

৫. কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনে লেখকের মনে কোন অনুভূতির সৃষ্টি হলো? তখন তিনি কী করলেন?

৬. **শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নীচের বিষয়গুলির মধ্যে কাজী নজরুলের লেখা কোন কোন গান খুঁজে পেলে লেখো:** স্বদেশপ্রেম বিষয়ক; প্রকৃতি বিষয়ক; হাসির গান/ছড়ার গান; প্রেমের গান;ধর্মীয় অনুষঙ্গের গান।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২১—২০০৯) : বাংলা সংগীত জগতের প্রবাদ পুরুষ। সংগীতই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। দেশ-বিদেশে বিপুল খ্যাতি সম্পন্ন এই শিল্পীর সংগীত সাধনার পীঠস্থান ছিল কোলকাতা শহর। হারিয়ে যাওয়া বাংলা পুরাতনী গানকে তিনি নতুন প্রাণ দিয়েছেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর ‘পুরাতনী’ নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি পুরনো কোলকাতা, তখনকার বাঙালি জীবন, নানান বিখ্যাত মানুষজনের স্মৃতিচারণ করেছেন।

আছেন কোথায় স্বর্গপুরে

লালন ফকির

আছেন কোথায় স্বর্গপুরে কেউ নাহি তার ভেদ জানে।
কেন জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা দেখায় আশমানে॥

পৃথিবী গোলাকার শুনি
অহর্নিশি ঘোরে আপনি।
তাইতে হয় দিন-রজনী
জ্ঞানীগুণী তাই মানে॥

তার একদিকেতে নিশি হলে
অন্যদিকে দিবা বলে।
আকাশ তো দেখে সকলে
খোদা দেখে কয়জনে॥

আপন ঘরে কে কথা কয়
না জেনে আশমানে তাকায়।
লালন বলে কে বা কোথায়
বুঝিবে দিব্যজ্ঞানে॥

লালন ফকির (অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ—উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক) : জন্মস্থান যশোহরের ঝিনাইদহ। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তিনি নিজে ধর্ম বিষয়ে উদার ছিলেন। বাউল ধর্মই তাঁর অন্তরের ধর্ম। এই সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর গান মূলত আধ্যাত্মিক, সংকেতে ভরা। লালনের গানের ভাষা সরল, ভাব গভীর। পাঠের গানটি আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ‘লালন সমগ্র’ (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ) থেকে গৃহীত।

স্মৃতিচিহ্ন

কামিনী রায়

ওরা ভেবেছিল মনে আপনার নাম
মনোহর হর্ম্ম্যরূপে বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক-প্রস্তরে রচি চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম!
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের 'পরে,
চারিদিকে ভগ্ন স্তূপ, তাহাদের তলে,
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে।
মানব হৃদয়-ভূমি করি' অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এতো বোঝা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন—
কাল-স্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল ॥
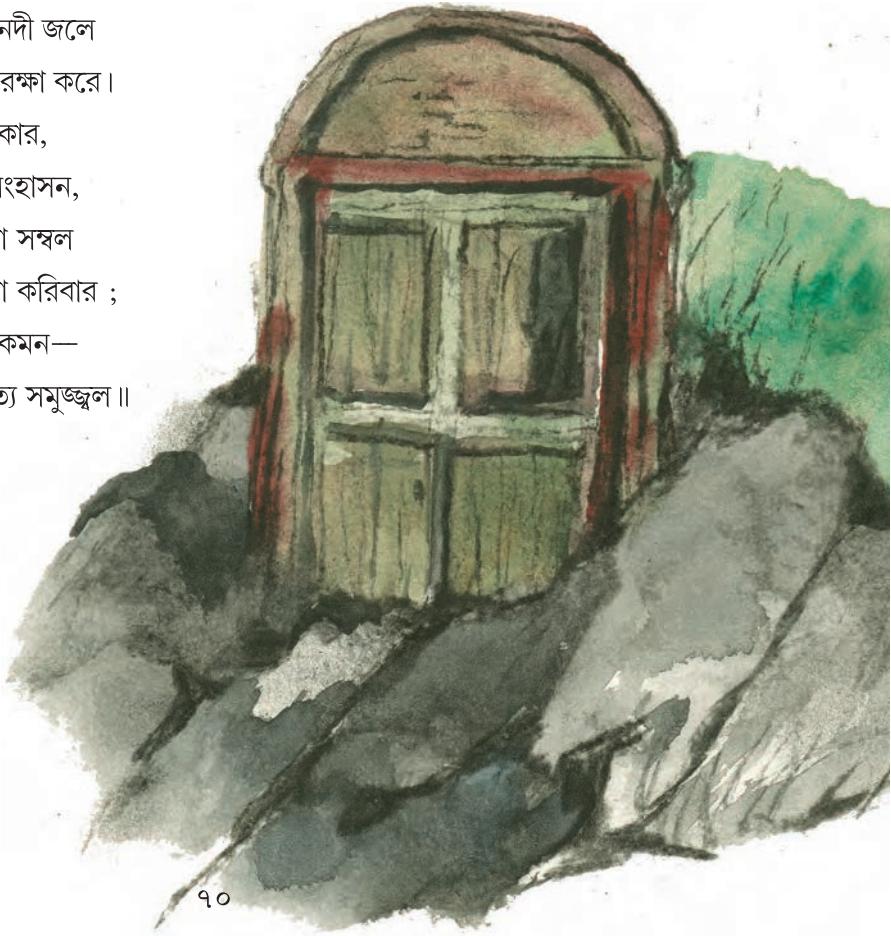
- **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

  ক. মহৎ মানুষদের জীবন কথা আমরা পাঠ করে থাকি কেন?

  খ. অত্যাচারী কোন কোন সাম্রাজ্যলোভী জাতির কথা তুমি ইতিহাস পড়ে জেনেছ?

  গ. অতীত ইতিহাসের ধূসর হয়ে আসা কোন স্মারক / সৌধ / মিনার তুমি দেখেছ?

  ঘ. তোমার দৃষ্টিতে কাদের কথা সমাজের সকলের চিরকাল মনে রাখা উচিত?

  ঙ. মানুষ নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় কেন?

শব্দার্থ : হর্ম্ম্য—অট্টালিকা। ইষ্টকপ্রস্তরে—ইটপাথরে। ভূম—মাটি। কালনদী—সময়ের স্রোত।

১. **নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তাদের পাশে ✓ চিহ্ন আর যেগুলো ভুল তাদের পাশে ✗ চিহ্ন দাও :**

১.১ ইট-পাথরে গড়া সৌধ কাউকে চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১.২ যাঁরা নিজেদের সৌধ গড়ে কীর্তিকে অমর করে রাখতে চান তাঁরা বরেণ্য।

১.৩ সাধারণ মানুষের মনে যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁদের নাম ভেসে যায়।

১.৪ এমন বহু সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র মানুষ আছেন, মহাকাল যাঁদের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি।

১.৫ ‘মানব হৃদয়-ভূমি’ অধিকার করতে হলে মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে।

২. **কবিতা থেকে শব্দ চয়ন করে নীচে প্রদত্ত কবিতাংশের শূন্যস্থান পূরণ করো :**

“ওরা ভেবেছিল ____ আপনার নাম
মনোহর ____ বিশাল ____
ইষ্টক ____ রচি চিরদিন ____
রেখে ____ !

৩. **নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

মনোহর, বিশাল, মূঢ়, ব্যর্থ, ভগ্ন, লুপ্ত, শুষ্ক, অধিকার, দৃঢ়, অক্ষুণ্ণ, ধৌত, নিত্য, সমুজ্জ্বল।

৪. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো :**

নাম, মনোহর, প্রস্তর, মূঢ়, ব্যর্থ, ভগ্ন, স্তূপ, স্মৃতি, রক্ষা, মানব, হৃদয়, প্রতিষ্ঠা, দৃঢ়, দরিদ্র।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) : বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় বরিশাল জেলার বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরণ সেন। তিনি অতি শৈশবকাল থেকে কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **‘আলো ও ছায়া’** মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। তিনি বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি.এ. পাস করে ওই কলেজেই শিক্ষাব্রতীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—**‘পৌরাণিকী’**, **‘দীপ ও ধূপ’**, **‘জীবনপথে’**, **‘মাল্য ও নির্মাল্য’**, **‘অশোক সঙ্গীত’** প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ লাভ করেন।

৫. নীচের শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করো :

অক্ষর, চিরদিন, স্মৃতি, মানব, রক্ষা, অধিকার, সম্বল, প্রতিষ্ঠা।

৬. নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

মনোহর, মনস্কাম, ব্যর্থ, সিংহাসন, প্রতিষ্ঠা, সমুজ্জ্বল, প্রস্তর।

৭. নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো :

আপনার, রচি, তরে, খসিছে, ভূমে, আছিল, হের।

৮. সমার্থক শব্দ লেখো :

মন, হর্ম্য, মূঢ়, দরিদ্র, নদী।

৯. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :

৯.১ 'স্মৃতিচিহ্ন' কবিতাটি কার রচনা?

৯.২ কবিতাটি তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

৯.৩ কবিতাটি কী জাতীয় রচনা?

৯.৪ কবিতায় কবি কাদের 'মূঢ়' ও 'ব্যর্থ মনস্কাম' বলেছেন?

৯.৫ তাদের স্মৃতি কীভাবে লুপ্ত হয়ে যায়?

৯.৬ কারা মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে?

৯.৭ 'কাল' কে কবিতায় কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

৯.৮ কবিতায় 'শুষ্ক তৃণ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১০. তিন-চারটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১০.১ 'ওরা ভেবেছিল মনে...'— কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা কী ভেবেছিল?

১০.২ 'মূঢ় ওরা'— কবিতায় তাদের মূঢ় বলার কারণ কী?

১০.৩ 'কেবা রক্ষা করে'— কী রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে? তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না কেন?

১০.৪ 'দরিদ্র আছিল তারা'— কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের রাজত্ব কীভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে কবি মনে করেন?

১০.৫ কালস্রোতে কাদের নাম ধুয়ে যায়? সেই স্রোত কাদের স্মৃতি গ্রাস করতে পারে না?

১০.৬ 'মানবহৃদয় ভূমি করি অধিকার'—কারা, কীভাবে মানবহৃদয় ভূমি অধিকার করে?

১০.৭ কবিতায় কবি কোন 'স্মৃতি'কে কেন অবিনশ্বর ও 'নিত্য সমুজ্জ্বল' বলেছেন?

১০.৮ তোমার দৃষ্টিতে মানুষের স্মরণীয় হয়ে থাকার শ্রেষ্ঠ পন্থাটি কী?

১১. স্মরণীয় কয়েকজন বাঙালি মনীষীর চিত্র ও বাণীসম্বলিত একটি চার্ট তৈরি করো।

১২. তুমি যাঁর জীবনের কথা জেনে অনুপ্রাণিত, এমন একজন মনীষীর জীবনের কোনো বিশেষ ঘটনার কথা বন্ধুকে লিখে জানাও/সে সম্বন্ধে দেওয়াল পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করো।

১৩. কবিতাটি থেকে যে শিক্ষা পেলে, সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

চিরদিনের

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

জোড়া দিঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হলেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে,
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে,
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতি তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষির কানে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে॥

শব্দার্থ : বৃষ্টিমুখর—বৃষ্টিপতনের ধ্বনিপূর্ণ। ঘোষিত—প্রচারিত। আত্মদান—পরার্থে নিজের জীবন দান। ঢেঁকি—ধান ভানবার যন্ত্রবিশেষ। মজা নদী—বুজে যাওয়া নদী। দাওয়া—বারান্দা, রোয়াক। সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন। আকাল—দুর্ভিক্ষ, দুঃসময়। কিষান—কৃষাণ,কৃষক, চাষি। দিশাহারা—দিগ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জনমত—সাধারণ বা অধিকাংশ লোকের অভিমত। ধ্বনি—শব্দ, রব।

১. নীচের শব্দগুলির অন্তত দুটি অর্থ লেখো এবং দুটি পার্থক্য বাক্যে প্রয়োগ করো :

কাঁটা, তাল, জোড়া, সারি, মজা, পাশ।

২. নীচের শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করে দুটি আলাদা বাক্য তৈরি করো :

কাঁটা পার জড়ো সব দীপ

কাটা পাড় জড় শব দ্বীপ

৩. ঠিক বানানটি বেছে নাও:

ব্যাস্ত/ব্যস্ত, সান্ধ্য/সান্ধ, দূর্ভিক্ষ/দুর্ভিক্ষ, বধু/বধূ, ধ্বনি/ধনি, সুবর্ণ/সুবর্ন।

৪. নীচের শব্দগুলির কোনটি বিশেষ্য এবং কোনটি বিশেষণ বাছাই করে আলাদা দুটি স্তম্ভে সাজাও। এরপর বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ এবং বিশেষণগুলির বিশেষ্যের রূপ লেখো :

লাজুক, ব্যস্ত, মাঠ, সন্ধ্যা, গ্রাম, ঘর, ঘোষিত, চাষি, জল, ফসল।

৫. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

মুখর, অহংকারী, অন্ধকার, একটানা, বিচিত্র।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর ও জনপ্রিয় কবি। 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত। বাংলা কবিতায় তিনি সাম্যবাদী চেতনার বিস্তার ঘটান। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠে কড়া'। 'চিরদিনের' কবিতাটি তাঁর 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৬. ‘ঘড়ির কাঁটা’— এখানে ‘ঘড়ি’ আর ‘কাঁটা’, এই দুটি শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করেছে ‘র’ বিভক্তিটি, ‘ঘড়ির কাঁটা’-কে আমরা তাই বলবো সম্বন্ধ পদ। এই কবিতায় এই রকম আরো ক’টি উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছো, লেখো।

একটি করে দেওয়া হল— তালের সারি।

৭. **সন্ধিবিচ্ছেদ করো :**

বৃষ্টি, অহংকার, স্বাগত, পরস্পর, দুর্ভিক্ষ।

৮. **নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৮.১ রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে।

৮.২ এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে।

৮.৩ এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস।

৮.৪ ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে।

৮.৫ কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে।

৯. **বাক্য বাড়াও :**

৯.১ চলে গেল লোক। (কখন? কেন? কোথায়?)

৯.২ আজ বিদ্রোহ বুঝি করে। (কে? কখন?)

৯.৩ ঘোমটা তুলে দেখে নেয় কোনোমতে। (কে? কী? কোথায়?)

৯.৪ এ গ্রাম সবুজ ঘাঘরা পরে। (কেমন? কীসের?)

৯.৫ দীপ জ্বলে। (কোথায়? কখন?)

১০. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

১০.১ ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা কোথায় গিয়ে থেমে গেছে?

১০.২ তালের সারি কোথায় রয়েছে?

১০.৩ কিষানপাড়া নীরব কেন?

১০.৪ বর্ষায় কে বিদ্রোহ করে?

১০.৫ কে গোয়ালে ইশারা পাঠায়?

১০.৬ রাত্রিকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয়?

১০.৭ কোথায় জনমত গড়ে ওঠে?

১০.৮ ঠাকুমা কাকে , কখন গল্প শোনান?

১০.৯ কোন গল্প তিনি বলেন?

১০.১০ সকালের আগমন কীভাবে ঘোষিত হয়?

১০.১১ কবিতায় কোন কোন জীবিকার মানুষের কথা আছে?

১১. আট দশটি বাক্যে উত্তর দাও:

১১.১ এই কবিতায় বাংলার পল্লি প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখো।

১১.২ কবিতাটিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপনের যে ছবিটি পাও তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১১.৩ আকাল ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মানুষের সম্মিলিত শ্রম আর জীবনীশক্তি কীভাবে বিজয়ী হয়েছে, কবিতাটি অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

১১.৪ ‘‘কোনো বিশেষ সময়ের নয়, বরং আবহমান কালের বাংলাদেশ তার প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে জীবনের যে জয়গান গেয়ে চলেছে, এই কবিতায় তারই প্রকাশ দেখতে পাই।”— উপরের উদ্ধৃতিটির সাপেক্ষে কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

১২. ব্যাখ্যা করো:

১২.১ ‘‘এখানে বৃষ্টিমুখর...... ঘড়ির কাঁটা”।

১২.২ ‘‘এ গ্রামের পাশে..... বিদ্রোহ বুঝি করে”।

১২.৩ ‘‘দুর্ভিক্ষের আঁচল.....কাজ করে”।

১২.৪ ‘‘সারাটা দুপুর....বিচিত্র ধ্বনি ওঠে”।

১২.৫ ‘‘সবুজ ফসলে সুবর্ণযুগ আসে”।

১৩. তোমার দেখা একটি গ্রামের কথা ডায়েরিতে লেখো। গ্রামটি কোথায়, সেখানে কোন কোন জীবিকার কতজন মানুষ থাকেন ইত্যাদি জানিয়ে গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষজনের জীবনযাপন পদ্ধতি, বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা লেখো। গ্রামটির উন্নতিসাধনে যদি তোমার কোনো পরামর্শ দেওয়ার থাকে, অবশ্যই সেকথা লিখবে।
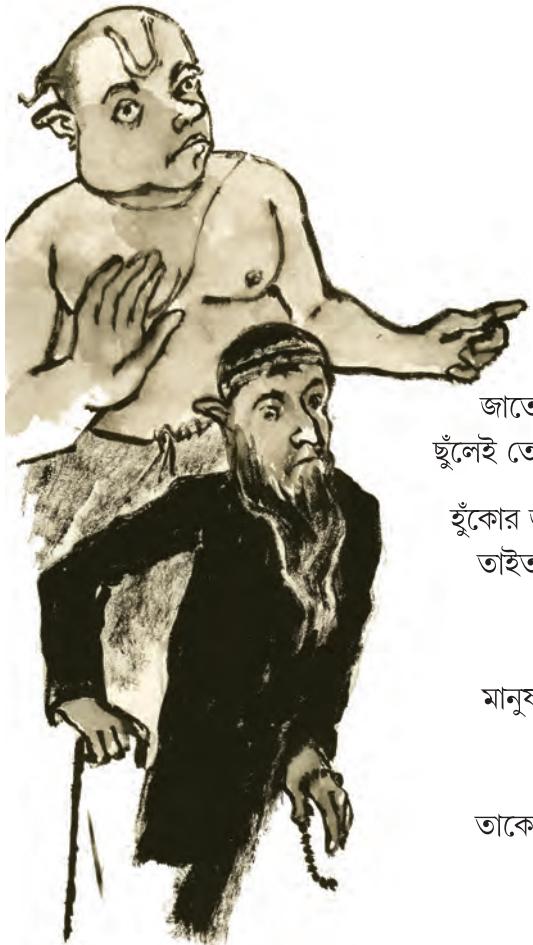
জাতের বজ্জাতি

কাজী নজরুল ইসলাম

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান!
এখন দেখিস ভারতজোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥

জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল!
যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,
যাক না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥

(সংক্ষেপিত)

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮—১৯৭৬) : জন্ম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় কবি। বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী'। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'চক্রবাক' প্রভৃতি। তিনি 'ধূমকেতু' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি কিছু উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নাটক লিখেছেন। তাঁর রচিত অজস্র গান বাঙালির অমূল্য সম্পদ।

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে

রজনীকান্ত সেন

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
আমি জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এসো, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে চির নভনীলে,
ভূধর-সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়
শশী-তারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০) : জন্ম পাবনায়, ভাঙাবাড়ি গ্রামে। কর্মজীবনে আইনজীবী ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বাণী’। কান্তকবি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মূলত গান রচয়িতা। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘কল্যাণী’, ‘অমৃত’, ‘আনন্দময়ী’, ‘বিশ্রাম’, ‘অভয়া’ প্রভৃতি। ভক্তিমূলক, দেশপ্রেম বিষয়ক, হাসির গান রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

সপ্তম পাঠ

ভানুসিংহের পত্রাবলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছোয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে,— কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পুবে বাতাসের উড়ে-পড়া জটাজাল।
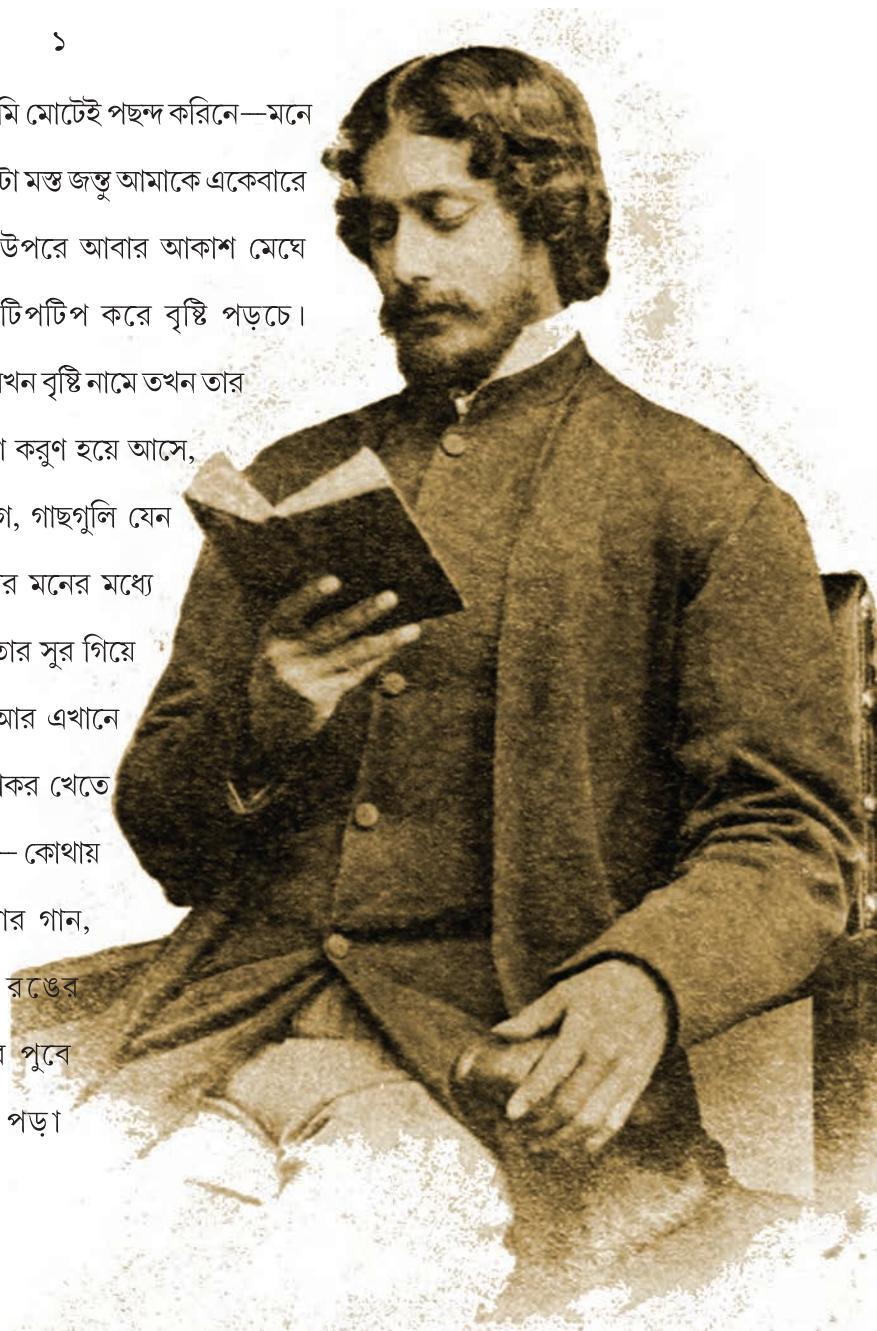
কথা হচ্ছে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুনগুন স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এসরাজে বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হলো কলকাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

২

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লির আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠচে ; ঘন বাঁশের ঝাড় ; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে ; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে , তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে। আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়, —খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেকদিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে,— পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়, — ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগচে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ বর্ষামঙ্গল (আষাঢ়/অগ্রহায়ণ/শ্রাবণ) মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

১.২ শান্তিনিকেতন (বীরভূম/বাঁকুড়া/পুরুলিয়া) জেলায় অবস্থিত।

১.৩ কবি (আত্রাই/পদ্মা/শিলাবতী) নদীর ওপর বোটে করে ভেসে চলেছেন।

১.৪ পৃথিবীর মনের কথাটি কবি শুনতে পান (জলের ওপর/ নদীর ওপর/মাটির ওপর)।

১.৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি পত্রসাহিত্যের উদাহরণ হল— (শেষের কবিতা/গীতাঞ্জলি/ছিন্নপত্র)।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

২.১ ‘‘কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে’’— কবির এই অপছন্দের কারণ কী?

২.২ ‘‘সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে’’— কোন গানের কথা বলা হয়েছে? সে গান কলকাতা শহরের হাটে জমবে না—কবির এমন ভাবনা কেন?

২.৩ ‘‘তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে’’— কার উদ্দেশ্যে কবি একথা লিখেছেন? ‘ওখানে’ বলতে কোন জায়গার কথা বলা হয়েছে?

২.৪ ‘‘শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে...’’— তখন কবির কেমন অনুভূতি হয়?

২.৫ ‘‘আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে’’— ‘আজ’ বলতে যে দিনটির কথা বলা হয়েছে তার সাল ও তারিখ কত? ‘সে’—বলতে কার কথা বলা হয়েছে? সে কোথায় পালাবে এবং কেন?

২.৬ ‘‘সমস্তটার উপর বাদল—সায়াহ্নের ছায়া’’— কবির চোখ দিয়ে দেখা এই ‘সমস্তটা’-র বর্ণনা দাও।

২.৭ ‘‘কলকাতায় না এলে আরো জমত’’— কী জমত? কবির কলকাতায় আসার সঙ্গে তা না জমে ওঠার সম্পর্ক কী?

২.৮ ‘‘খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়’’— কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে? খাতার দিকে চোখ রাখবার সময় কবির নেই কেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ‘কথা ও কাহিনী’, ‘সহজপাঠ’, ‘রাজর্ষি’, ‘ছেলেবেলা’, ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ হাস্যকৌতুক’, ‘ডাকঘর’, ‘গল্পগুচ্ছ’- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে ‘Song Offerings’- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

পাঠ্যাংশটি তাঁর লেখা চিঠির সংকলন ‘ভানুসিংহের পত্রাবলি’ বই থেকে নেওয়া হয়েছে ।

৩. **দু-চার কথায় পরিচয় দাও :**

শান্তিনিকেতন, দিনু, বর্ষামঙ্গল, আত্রাই।

৪. **একটি বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি ছোটো অনুচ্ছেদ রচনা করো।**

৫. **অর্থ লেখো :**

পুলক, উত্তরীয়, এসরাজ, আঙিনা, সায়াহ্ন, প্রয়াস, নিভৃত।

৬. **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৬.১ কোলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে।
৬.২ তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা।
৬.৩ আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে।
৬.৪ কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।
৬.৫ সে গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে।

৭. **বাক্য রচনা করো :**

শান্তিনিকেতন, হাট, বাদল, বৃষ্টিধারা।

৮. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :**

সুর	—	শূর	আষাঢ়	—	আসার
নৃত্য	—	নিত্য	কূল	—	কুল
বর্ষা	—	বর্শা	সাড়া	—	সারা

শব্দার্থ : উত্তরীয় — চাদর। শৈবাল---শ্যাওলা। ছায়াবিষ্ট---ছায়ায় ঢাকা। ঘনিমা---ঘন হয়ে আসা। ম্লান—বিবর্ণ মলিন। আঙিনা—উঠোন। সায়াহ্ন—সন্ধে।

টীকা : দিনুবাবু---দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২—১৯৩৫)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। রবীন্দ্র সংগীতের প্রধান স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ফাল্গুনী’ নাটক দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁকে ‘আমার সকল গানের ভাণ্ডারী’ নামে অভিহিত করেন।

৯. বর্ষার কলকাতা শহরকে কবির বিশেষভাবে অপছন্দ করার কারণ কী?
১০. নববর্ষা বলতে কী বোঝ?
১১. বর্ষার ঋতুকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি গান ও দুটি কবিতার নাম লেখো।
১২. সবুজ রঙের উত্তরীয় বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
১৩. কলকাতা শহরে হাট...শহরকে হাটের সঙ্গে তুলনার ব্যঞ্জনাটি কোথায়?
১৪. আষাঢ় মাসের বর্ষাকে কলকাতা শহরে মানায় না— কবির এ জাতীয় মন্তব্যের অর্থ কী?
১৫. আত্রাই নদীটি কোথায়? সেই নদীতে বোটে যেতে যেতে কবি কবে নির্বাচিত পত্রটি লিখেছিলেন?
১৬. নদীপাড়ের গ্রামগুলির ছবি কীভাবে কবির চোখে ধরা পড়েছে?
১৭. আকাশ আর নদীর প্রতি ভালোবাসা, সর্বোপরি বর্ষা প্রকৃতির প্রতি কবির পক্ষপাত কীভাবে পত্রদুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

১৮. **ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো:**

১৮.১ কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।
১৮.২ অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে।
১৮.৩ আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেছে।
১৮.৪ আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি।
১৮.৫ অনেকদিন বোলপুরের শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি।

১৯. **নীচের বাক্যগুলিকে দুটি বাক্যে আলাদা করে লেখো :**

১৯.১ কথা হচ্ছে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।
১৯.২ শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে।
১৯.৩ আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই।
১৯.৪ আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়, খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়।
১৯.৫ আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগচে না।

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্‌বৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর॥
বর্ষণগীত হলো মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর॥
দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হলো ক্ষীণ, দিকে দিকে হলো দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর॥

ভারততীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চিন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে— তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

■ **নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১. কবিতায় ভারতভূমিকে ‘পুণ্যতীর্থ’ বলা হয়েছে কেন?

২. ‘মহামানবের সাগরতীরে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৩. ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে, কবিতা থেকে এমন একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করো।

৪. ভারতবর্ষকে পদানত করতে কোন কোন বিদেশি শক্তি অতীতে এদেশে এসেছিল? তাদের পরিণতি কী ঘটল?

৫. ‘পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার’ — উদ্ধৃতাংশে কোন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে? এমন পরিস্থিতিতে কবির অন্বিষ্ট কী?

৬. ‘আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।’

— কোন সুরের কথা বলা হয়েছে? তাকে ‘বিচিত্র’ বলার কারণ কী? কেনই বা সে সুর কবির রক্তে ধ্বনিত হয়?

৭. ‘হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো...’

—‘রুদ্রবীণা’ কী? কবি তার বেজে ওঠার প্রত্যাশী কেন?

৮. ‘আছে সে ভাগ্যে লিখা’— ভাগ্যে কী লেখা আছে? সে লিখন পাঠ করে কবি তাঁর মনে কোন শপথ গ্রহণ করলেন?

৯. ‘পোহায় রজনী’—অন্ধকার রাত শেষে যে নতুন আশার আলোকোজ্জ্বল দিন আসবে তার চিত্রটি কীভাবে ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় রূপায়িত হয়েছে?

১০. ‘মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা’ — কবি কাদের ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন? কোন মায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে? এ কোন অভিষেক? সে অভিষেক কীভাবে সম্পন্ন ও সার্থক হবে?

১১. টীকা লেখো :

ওংকারধ্বনি, শক, হুন, মোগল, দ্রাবিড়, ইংরাজ।

১২. ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের কথা কবিতায় কীভাবে বিধৃত হয়েছে?

১৩. কবির দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্নিল ছবি ধরা পড়েছে, তার পরিচয় দাও।

১৪. বাক্যে প্রয়োগ করো :

উদার, ধৃত, পবিত্র, লীন, মন্ত্র, অনল, বিপুল, বিচিত্র, সাধনা, জয়গান।

১৫. প্রতিশব্দ লেখো :

সাগর, ধরিত্রী, ভূধর, হিয়া, রজনী, নীর।

শব্দার্থ : ভূধর—পৃথিবী। ভেদি—ভেদ করে। শোণিত—রক্ত। হেরো—দেখো। বিরাজ—থাকা। ওংকার ধ্বনি—সকল মন্ত্রের আদি ধ্বনি। অভিষেক—সিংহাসনে বসবার প্রথম দিনের যে অনুষ্ঠান। কলরব—চিৎকার। আনত শিরে—মাথা নিচু করে।

১৬. ‘শালা’ শব্দের একটি অর্থ গৃহ, আগার।

‘যজ্ঞশালা’ র অনুরূপ ‘শালা’ পদযুক্ত আরো পাঁচটি শব্দ লেখো।

১৭. নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি গদ্য বাক্যে লেখো :

১৭.১ দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হলো হারা।

১৭.২ উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

১৭.৩ হৃদয়তন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

১৭.৪ হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।

১৭.৫ হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

১৮. বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করো :

চিত্ত, পুণ্য, পবিত্র, এক, দ্বার, বিচিত্র, তপস্যা, দুঃখ, জয়, জন্ম, শুচি, লাজ।

১৯. সন্ধি বিচ্ছেদ করো : পরমানন্দ, দুর্বার, ওংকার, হোমানল, দুঃসহ।

২০. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : পুণ্য, ধীর, ধৃত, আহ্বান, দুর্বার, বিচিত্র, বহু, অপমান, বিপুল, ত্বরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ‘কথা ও কাহিনী’, ‘সহজপাঠ’, ‘রাজর্ষি’, ‘ছেলেবেলা’, ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ হাস্যকৌতুক’, ‘ডাকঘর’, ‘গল্পগুচ্ছ’- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে ‘Song Offerings’- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটি ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী

কমলা দাশগুপ্ত

ননীবালা দেবী

ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে। দেশও সেখানেই। পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জী, মা গিরিবালা দেবী। এগারো বছর বয়সে বিবাহের পর ষোলো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছেই ফিরে আসেন। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী। সম্পর্কে তিনি ননীবালা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পলাতক অমর চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দুই মাস আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিষড়াতে। পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এখানেও।

তল্লাশির সময় অমর চ্যাটার্জী পলাতক হন এবং রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হন।
গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা 'মসার' (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি। তখন বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে, রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইনটারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে যে-যুগ ছিল তখন বাঙালি বিধবাদের পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিয়ে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পুলিশ তো নয়ই, কোনো সাধারণ মেয়েও নয়। আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ, আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান। সেদিনকার নারী তৈরি করে দিয়ে গেছেন পরবর্তী যুগের বিপ্লবী নারীকে—তিনি পথ দেখিয়েছেন, ভিত্তি গেঁথে গেছেন তাঁদের জন্য।

পুলিশ ক্রমে জানতে পারল যে, ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। কিন্তু জানল না যে, ইনিই রিষড়াতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। রিষড়ার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে, বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। আবার ননীবালা দেবী এলেন গৃহকর্ত্রীর বেশে।

পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল। এই নিশাচরেরা সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘরে কাটিয়ে দিতেন। শুধু রাতে সুবিধামতো বেরিয়ে পড়তেন। নিষ্ঠুর শিকারির মতো পুলিশ এসে পড়লেই এই পলাতকেরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, পুলিশ হয়রান হয়ে ফিরত।

এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি ও বিপ্লবীদের নিমেষে পলায়নের পর ননীবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হলো না। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে।

ননীবালা পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র কর্মোপলক্ষে যাচ্ছিলেন পেশোয়ার। বাল্যবন্ধু তাঁর দাদাকে অনেক অনুনয় করে রাজি করালেন ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। প্রায় ষোলো-সতেরো দিন পরে পুলিশ সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে—তখন ননীবালা দেবীর কলেরা চলছে তিনদিন যাবৎ। প্রথমদিন বাড়ি ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তাঁকে পুলিশ-হাজতে স্ট্রেচারে করে। কয়েকদিন সেখানে রেখে চালান করে দিল কাশীর জেলে। তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছেন।

কাশীতে আসার কয়েকদিন পরে, প্রতিদিন তাঁকে জেল-গেটের অফিসে এনে কাশীর ডেপুটি পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট জিতেন ব্যানার্জী জেরা করত। ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন; বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই জানেন না।

কাশীর জেল পুরনো, সেকেলে। সেখানে প্রাচীরের বাইরে মাটির নীচে একটা ‘পানিশমেন্ট সেল’ অর্থাৎ শাস্তি-কুঠুরি ছিল। তাতে দরজা ছিল একটাই, কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবার জন্য কোনো জানালা দরজা ছিল না। ব্যর্থকাম জিতেন ব্যানার্জী তিন দিন প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে ননীবালা দেবীকে ঐ আলোবাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবন্ধ করে আটকে রাখত। কবরের মতো সেলে আধঘণ্টা পরে দেখা যেত ননীবালা দেবীর অর্ধমৃত অবস্থা, তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না। তৃতীয় দিনে বন্ধ রাখল তাঁকে আধঘণ্টারও বেশি, প্রায় ৪৫ মিনিট। স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননীবালা দেবী পড়ে আছেন মাটিতে, জ্ঞানশূন্য।

হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ননীবালা দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

সেখানে আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করত।

—আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। কী করলে খাবেন?

—যা চাইব তাই করবেন?

—করব।

—আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহলে খাব।

—আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন।

গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল। আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ননীবালা এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে। দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই অন্য সি.আই.ডি. কর্মচারীরা তাঁর উদ্যত হাতকে চেপে ধরে রাখল, পিসিমা, করেন কী? অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন ননীবালা দেবীর ভিতর থেকে।

—ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায় দরখাস্ত লিখতে বলেছিল কেন? আমাদের দেশের মানুষের কোনো মানসম্মান থাকতে নেই?

দুই বছর এইভাবে বন্দিজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালের এক প্রাতে এল ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ।

বাইরে এসে তাঁর মাথা গুঁজবারও স্থান মিলল না। সকলেই পুলিশকে ভয় পায়। বহুদিন ধরে চলেছিল অনেক ওলটপালট ও ভাঙাগড়া। তারপর একটা আধঘুপচি ঘর ভাড়া করে নিজের জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে, আত্মীয়স্বজনের অনাদর ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির হয়ে কাটিয়ে চলেছিলেন তিনি বছরের পর বছর।

যে-মেঘের আত্মদানে পরবর্তীকালে শ্রাবণবর্ষণের মতো ঝরে পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা, এই মহীয়সী ছিলেন সেই পরিণতিসম্ভবা মেঘ।

দুকড়িবালা দেবী

১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৪, ৬ শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম জেলায় নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মা কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই ফণীভূষণ চক্রবর্তী।

তাঁর বোনপোর নাম নিবারণ ঘটক। তিনি ছিলেন মাইনিং ক্লাসের ছাত্র। মাসিমা দুকড়িবালা নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তাঁর বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশি বই, বেআইনি বই লুকিয়ে পড়বার আড্ডা ছিল মাসিমার বাড়ি।

বললেন, 'এবার আমায় দলে নিয়ে নাও।' বোনপো নিবারণ বলেন, 'তুমি কি এপথে আসতে পারবে মাসিমা? এমন বিপদের মুখে পা বাড়াতে নাই-বা এলে?' সিংহী গর্জে উঠে বললেন, 'তুমি যদি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পার, তোমার মাও পারে।'

একদিন বোনপো নিবারণ সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিলেন মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে। এগুলি ছিল রডা কোম্পানি থেকে চুরি করে আনা জিনিস। এই চুরির কাহিনি অভিনব। ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির জেটি-সরকার শ্রীশ মিত্র বড়োসাহেবের হুকুম মতো মালপত্র খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্রপূর্ণ বাকসো খালাস ক'রে সাতটি গোরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে থাকেন। ছখানা গাড়ি তিনি রডা কোম্পানির গুদামে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ির গাড়োয়ান ছদ্মবেশী বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়িটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়িতে ৯টি বাক্সে ছিল কার্তুজ এবং একটিতে ৫০টি মসার পিস্তল। মালগুলি পরে বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন পুলিশ দুকড়িবালা দেবীর বাড়ি ঘিরে ফেলে। তল্লাশিতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসিমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাঁকে পিস্তলগুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

বন্দীজীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও, প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী-সৈনিকেরা। মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। সম্ভবত ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। *(ঈষৎ পরিবর্তিত ও নির্বাচিত অংশ বিশেষ)*

১. **ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

১.১ ননীবালা দেবী বিপ্লবের দীক্ষা পেয়েছিলেন (অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী/যাদুগোপাল মুখার্জী/ভোলানাথ চ্যাটার্জী)- এর কাছে।

১.২ ননীবালা দেবী (রিষড়াতে/চুঁচুড়াতে/চন্দননগরে) অমর চ্যাটার্জী ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে আশ্রয় দেন।

১.৩ চন্দননগর থেকে পালিয়ে ননীবালা দেবী যান (পেশোয়ারে/ কাশীতে/রিষড়াতে)।

১.৪ কাশীর ডেপুটি পুলিস সুপার (জিতেন ব্যানার্জী/হিতেন ব্যানার্জী/যতীন ব্যানার্জী) ননীবালা দেবীকে জেরা করতেন।

১.৫ পুলিশ সুপার গোল্ডির কাছে ননীবালা দেবী (সারদামনি দেবী/ভগিনী নিবেদিতা/দুকড়িবালা দেবী)-র কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

১.৬ দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন (বোনপো/ভাইপো/ ভাই) নিবারণ ঘটকের কাছে।

১.৭ বিপ্লবী হরিদাস দত্ত (গাড়োয়ান/পুলিস/খালাসি)-র ছদ্মবেশে পিস্তল চুরি করেন।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

২.১ বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারের ‘মসার’(পিস্তল)-এর খোঁজ নেওয়ার জন্য ননীবালা দেবী কী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন?

২.২ ‘‘এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল’’—‘হুলিয়া’ শব্দটির অর্থ কী? এঁরা কারা? এঁদের আশ্রয়দাত্রী কে ছিলেন? হুলিয়া থাকার জন্য এঁরা কীভাবে চলাফেরা করতেন?

২.৩ ‘‘ননীবালা দেবী পলাতক হলেন’’—ননীবালা দেবী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? তিনি পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? সেখানে তিনি কোন অসুখে আক্রান্ত হন?

২.৪ ‘‘ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন’’—ননীবালা দেবী কোন কথা অস্বীকার করতেন? তার ফলশ্রুতিই বা কী হতো?

২.৫ কাশীর জেলের ‘পানিশমেন্ট সেল’—টির অবস্থা কেমন ছিল? সেখানে ননীবালা দেবীর ওপর কী ধরনের অত্যাচার করা হত?

২.৬ ‘‘ননীবালা দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন’’—ননীবালা দেবী কাকে দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন? দরখাস্তের বিষয়বস্তু কী ছিল? শেষপর্যন্ত সেই দরখাস্তের কী পরিণতি হয়েছিল?

২.৭ ‘‘এবার আমায় দলে নিয়ে নাও’’—কে, কাকে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন? তিনি কেন, কোন দলে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন?

২.৮ পুলিশ কোন অভিযোগে দুকড়িবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করেন? বিচারে তাঁর কী শাস্তি হয়।

৩. আট-দশটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৩.১ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী স্বনামধন্য খ্যাতনামা বিপ্লবীদের তুলনায় ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীর অবদান সামান্য নয়—এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাও।

৩.২ ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীর অনমনীয় বৈপ্লবিক মনোভাব কীভাবে পরবর্তী কালের বিপ্লবী নারীকে পথ দেখিয়েছে?—পাঠ্য গদ্যাংশ অবলম্বনে তোমার মতামত জানাও।

৪. ননীবালা দেবী এবং দুকড়িবালা দেবী ছাড়া তুমি আর কোন কোন মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা জানো? তাঁদের অবদানের কথা শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও এবং খাতায় লেখো।

৫. ঘটনার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো :

৫.১ চন্দননগরে যাদুগোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীকে আশ্রয়দান ও সেখান থেকে পলায়ন করলেন ননীবালা দেবী।

৫.২ পেশোয়ার থেকে গ্রেপ্তার করে কাশীতে পাঠানো হল ননীবালা দেবীকে এবং আলোবাতাসহীন বদ্ধ ঘরে তালাবন্ধ করে শাস্তি দেওয়া হত।

৫.৩ বাগবাজারে মা সারদার কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে দরখাস্ত লিখলেন ননীবালা দেবী।

৫.৪ আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট গোল্ডি ননীবালা দেবীকে জেরা করতেন।

৫.৫ অমর চ্যাটার্জী ও তাঁর সহকর্মীকে রিষড়াতে দুইমাস আশ্রয় দিলেন ননীবালা দেবী।

৫.৬ পুলিশ সুপার গোল্ডি দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলায় ক্ষিপ্ত ননীবালা দেবী এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে।

৫.৭ ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী।

৫.৮ রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ননীবালা দেবী সংগ্রহ করলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর।

৬. কে, কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মিলিয়ে লেখো:

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার	—	আইন অমান্য আন্দোলন
মাতঙ্গিনী হাজরা	—	সিপাহী বিদ্রোহ
সরোজিনী নাইডু	—	ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ
ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই	—	লবণ সত্যাগ্রহ

৭. পাঠ্য গদ্যাংশটি পড়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে দু-চার কথা লেখো :

অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, প্রবোধ মিত্র, জিতেন ব্যানার্জী, গোল্ডি, নিবারণ ঘটক, হরিদাস দত্ত।

৮. অর্থ লেখো ও বাক্য রচনা করো :

হুলিয়া, মসার, দরখাস্ত, কারাদণ্ড, নিশাচর

শব্দার্থ : গ্রেপ্তার—আটক। তল্লাশি—খোঁজ। স্বীকারোক্তি—জবানবন্দি। ট্রাইবুনাল—বিচারসভা। জেরা—জবাবদিহি। জেটি সরকার—বন্দরে বা ঘাটে মালপত্র ওঠানামার হিসেব রাখেন যিনি।

৯. **নীচের স্থূলাক্ষর অংশগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ **বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর** কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী।

৯.২ ১৯১৫ সালে **চন্দননগরে** আবার বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

৯.৩ **স্নায়ুর শক্তিকে** চূর্ণ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।

৯.৪ এগুলি ছিল **রডা কোম্পানি থেকে** চুরি করে আনা মাল।

৯.৫ ছখানা গাড়ি তিনি **রডা কোম্পানির** গুদামে পৌঁছে দেন।

৯.৬ **তল্লাশিতে** পাওয়া যায় সাতটা **মসার পিস্তল**।

৯.৭ শতজেরাতে ও **মাসিমার মুখ থেকে** বের করতে পারল না।

১০. **এককথায় লেখো :**

পলায়ন করেছেন যিনি, একসঙ্গে কাজ করেন যিনি, বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ম দৃষ্টি, বাল্যকালের বন্ধু, আবেদন জানিয়ে লিখিত পত্র, মহানকর্মে ব্রতী নারী, এগিয়ে থাকেন যিনি/অগ্রে গমন করেন যিনি।

কমলা দাশগুপ্ত : ১৯০৭ --- ২০০০। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বর্ণময় চরিত্র। প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছেন । গোপনে বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করতেন। একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন ব্রিটিশের হাতে। তাঁর আত্মজীবনী ‘রক্তের অক্ষরে’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তিনি মন্দিরা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জীবন ও লড়াইয়ের ইতিহাস রাখা রয়েছে তাঁর ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী’ নামক গ্রন্থে (১৯৬৩)। পাঠ্য রচনাংশটি এই বই থেকেই নেওয়া।

নবম পাঠ

রাস্তায় ক্রিকেট খেলা

মাইকেল অ্যানটনি

বর্ষাকালে রাস্তায় ক্রিকেট খেলার সুযোগ মিলত অল্পই। যখনই খেলতে যেতাম, বৃষ্টি এসে আমাদের তাড়া করে ফের উঠোনে ঢুকিয়ে দিত। বর্ষাকালে এই রকমই ছিল মেয়ারো। সেখানকার আকাশ সর্বদাই মেঘে ঢাকা থাকত, সমুদ্রের ওপর জলভরা কালো মেঘ মুখ গোমড়া করে নিচু হয়ে ঝুলত, আর বাতাস ছুটে এসে বদমেজাজ ঝাপট মারত নারকেলবনে। আর বাতাসের তেজ আর গর্জন যখন চরমে উঠত, তখন ঝুলে-পড়া মেঘগুলো ঘনকালো হয়ে উঠত, সমুদ্র হুংকার দিত, আর বৃষ্টির ফলাগুলো হট্টরোলে ভেঙে পড়ত আমাদের ওপর।

সবে দৌড়ে ফিরেছি বৃষ্টি থেকে। পাশের বাড়ির অ্যামি আর ভার্ন-এর খুব ফুর্তি। ওরা হাসছে। আশ্চর্য, রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে ওদের যত আনন্দ, ঝমঝম বৃষ্টিতেও যেন ততই। অ্যামি আমাদের উঠোনে, হি হি করে হাসছে আর বৃষ্টির জল খাবার ভান করছে। ওর মুখ একেবারে ভেজা, জামাকাপড় জুবজুবে। ভার্ন আলশের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, সে-ও হুজুগে মেতে লাফ মেরে ওর সঙ্গে জুটল। ওরা চ্যাঁচাতে লাগল :

'নেবুর পাতায় করমচা,

হে বৃষ্টি, স্পেনে যা।'

একটু পরেই পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তাদের মা ; তিনি নিশ্চয়ই শব্দ শুনে বুঝেছিলেন। ভার্ন আর অ্যামি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হলো।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃষ্টির জন্য মনটা খারাপ। তারপর ভার্ন-এর ব্যাট আর বল বাড়ির তলায় ঢুকিয়ে রেখে ভেতরে গেলাম। 'নিকুচি!' মনে-মনে বললাম। যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমি ব্যাট করছিলাম। যখনই আমি ব্যাট করি, তখনই কেবল বৃষ্টি পড়ে! পাছে চাদর ময়লা হয়, তাই পা মুছে বিছানায় উঠে পড়লাম। বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলাম, মনে হচ্ছিল সত্যিই বৃষ্টিটা চলে যাক (স্পেনে যাক, ভার্ন যা বলেছিল), এমন সময় কলজেটা যেন লাফ দিয়ে আমার গলায় উঠে এল। আকাশ চিরে কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল।

তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলাম। ছাতের ওপর বৃষ্টির ভয়ানক হাতুড়ি পড়তে লাগল। বাজের ভয়ে সিঁটিয়ে রইলাম, জানি আবারও পড়বে, আর বিদ্যুতের অপার্থিব চমকের ভয়েও।

ভেতরে-ভেতরে হিংস্র আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম। বৃষ্টির ভয়, তার সঙ্গী বাজ-বিদ্যুতের ভয়, উপকূলে আছড়ানো সমুদ্রের ভয়, ঝোড়ো হাওয়ার ভয়, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর সবকিছু মরার মতো হয়ে থাকার ভয়। আর-একবার বিদ্যুৎ-ঝলকে চমকে উঠলাম। চমক ভাঙবার আগেই আবার এক-ভয়ংকর বজ্রপাতের শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। শুনতে পেলাম, মা ছুটে ঘরে ঢুকছে। আবার বাজ পড়ল আর আমি ছিটকে চলে গেলাম খাটের তলায়।

'সেলো! সেলো! প্রথমে তোর ব্যাট!' ভার্ন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে, কিন্তু আমি এখনও ঠিক সামলে উঠিনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইরের দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ভার্ন দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে আর অধৈর্যভরে হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে।

'তোর ব্যাট প্রথমে,' সে বলে। যেন আমাকে নির্বিকার দেখেই সদ্য-বেরোনো অ্যামির দিকে সে তাকায়। 'দু-নম্বর ব্যাট কে?'

'আমি!' আমি বলি।

'আমি!' প্রায় একই সঙ্গে অ্যামি চ্যাঁচায়।

'আমি দুনম্বর ব্যাট', ভার্ন বলে।

অ্যামি প্রতিবাদ করে, 'না, আমি আগে "আমি" বলেছি।'

ভার্ন অধীর হয়ে পড়ে, এদিকে অ্যামি আর আমি তর্ক করি। তারপর যেন তার মাথায় একটা মতলব আসে। পকেট থেকে একটা পেনি বার করে বলে, 'টস কর। কী চাস?'

আমি বলি, 'হেড।'

অ্যামি ডাকে, টেল। 'টেল পড়বেই?'

চাকতিটা ওপরে ওঠে, পড়ে উলটে যায়, টেল দেখা যায়।

ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠি, 'আমি খেলবই না!' তাতেও মনে হলো যথেষ্ট উৎপাত করা যায়নি, তাই দৌড়ে যাই যেখানে ভার্ন-এর ব্যাট আর বল রেখেছিলাম, সেগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনে অদৃশ্য। তারপর গায়ে যত জোর আছে তাই দিয়ে ওগুলোকে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলি।

যখন বাড়ির সামনে ফিরে আসি তখন ভার্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, 'সেলো, ব্যাট আর বল কোথায়?'

আমি রাগে ফুঁসতে থাকি। 'কীসের ব্যাট-বল, জানি না, যাও!'

'ওর বাড়িতে বলে দে,' অ্যামি চেঁচায়, 'ফেলে দিয়েছে?'

ভার্ন জোর করে মুখ বেঁকিয়ে হাসির ভঙ্গি করে, বলে, 'ভারি তো একটা পুরোনো ব্যাট আর বল।'

কিন্তু উঠোন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে, দেখতে পাই।

বাকি বর্ষাকাল আর রাস্তায় ক্রিকেট খেলিনি আমরা। কখনো-কখনো বৃষ্টি থামত, চড়া রোদ উঠত, বেড়ার ওদিকে অ্যামি আর ভার্ন-এর গলা শুনতে পেতাম। এইসব সময়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে নিজের মনে শিস দিতাম, মনে-মনে ইচ্ছে হতো ওরা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে আসতেও পারে। কিন্তু ওরা কখনও আসত না। আমি বুঝতাম ওরা তখনও খুব রেগে আছে, আর-কখনও আমাকে ক্ষমা করবে না।

এইভাবে চলল বর্ষাকাল। বজ্রে-বিদ্যুতে, উপসাগরের ঢেউয়ে আর মাতাল বাতাসে সেইরকমই ভয়-ধরানো ভাব। কিন্তু যে-সব লোকে এই কথা বলত, তারা বলত মেয়ারো তো এইরকমই, আর এই নিয়ে হাসাহাসি

চলত। আর কখনো-কখনো বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, এমনকী বাজের আওয়াজের মধ্যে দিয়েও বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে আসত ভার্ন-এর গলা, 'হে বৃষ্টি, স্পেনে যা,' আর আমি অনেকবার ঠিক করেছি সাহসী হবো কিন্তু যখনই বাজ পড়ত অমনি ছিটকে ঢুকতাম খাটের তলায়।

ভার্ন আর অ্যামির সঙ্গে আবার দেখা হলো নতুন বছরের গোড়ার দিকে। আনন্দের কথা, বর্ষা অনেকদিন কেটে গেছে ; দিনটা গরম, ঝকঝকে। বাড়ির দিকে পা চালাতে গিয়ে দেখি পা চালাচ্ছি ভার্ন আর অ্যামির দিকে, তারা সবে রাস্তায় ক্রিকেট খেলা শুরু করবে। কলজেটা দপদপায়। ওদের অবাস্তব আর অভিনব লাগে, যেন দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল, আর ফিরতে চাচ্ছিল না। আমি খুব কাছে না-এসে পড়া পর্যন্ত ওরা খেয়াল করেনি। তারপর দেখি অ্যামি চমকে উঠেছে, তার মুখ উদ্ভাসিত।

'ভার্ন,' সে চেঁচিয়ে ডাকে, 'এই ভার্ন, দ্যাখ, সেলো!'

লজ্জিত হয়ে মাটির দিকে তাকাই, গাছ দেখি, কমলা রঙের আকাশ দেখি, এত খুশি লাগে যে কী বলব ভেবে পাই না। ভার্ন ড্যাবড্যাব করে চায়, তার মুখে দাঁত বের করা অদ্ভুত হাসি। চকচকে নতুন ব্যাটটার ওপর থেকে সে সেলোফেন কাগজ ছিঁড়ছে।

খোশমেজাজে বলে, 'নে সেলো, তুইই আগে ব্যাট কর।'

আমি কেঁদে ফেলি। যেন বৃষ্টি পড়ছে আর আমি ভয় পেয়েছি।

তরজমা: তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল অ্যানটনি (১৯৩০) : জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়ারোতে। মেয়ারো আর ত্রিনিদাদে শিক্ষাপর্ব শেষ করে ইস্পাত কারখানায় কাজ নেন। পরে চলে যান ইংল্যান্ডে। তারপর নানা দেশ বিদেশে পাড়ি জমান। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র জীবন তাঁর উপন্যাসে আর গল্পে আশ্চর্য মূর্ত আর সজীব হয়ে ওঠে। পরম মমতায় তিনি বর্ণনা করেন আপাততুচ্ছ নানা ঘটনা আর তার মানবিক দিকগুলিকে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হলো— 'গ্রিন ডেজ বাই দ্য রিভার' (নদীর ধারে সবুজ দিনগুলি, ১৯৬৭), 'স্ট্রিটস অফ কনফ্লিক্ট' (পথে পথে সংঘাত, ১৯৭৬) গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'ক্রিকেট ইন দ্য রোড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' (রাস্তায় ক্রিকেট ও অন্যান্য গল্প, ১৯৭৩)

১. বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো:

১.১ বর্ষাকালে এমনই ছিল (মেয়ারো/ব্রাজিল/ত্রিনিদাদ)।

১.২ নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি (ইতালিতে/লন্ডনে/স্পেনে) যা।

১.৩ (ধুত্তোর/নিকুচি/ভাল্লাগেনা) মনে মনে বললাম।

১.৪ ভেতরে-ভেতরে (গুমোট/দুর্যোগপূর্ণ/হিংস্র) আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম।

১.৫ অ্যামি ডাকে (হেড/টেল)।

২. কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী পাশাপাশি বাক্য লেখো :

২.১ বর্ষাকালে রাস্তায় ক্রিকেট খেলার সুযোগ মিলত অল্পই।

২.২ ওরা চেঁচাতে লাগল, 'নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি, স্পেনে যা।'

২.৩ ভেতরে ভেতরে হিংস্র আবহাওয়াকে আমি ভয় পেতাম।

২.৪ লজ্জিত হয়ে মাটির দিকে তাকাই।

২.৫ খোলা মেজাজে বলে 'নে সেলো, তুইই আগে ব্যাট কর'।

২.৬ ওর চোখের কোণে জল চিকচিক করে দেখতে পাই।

শব্দার্থ: হুংকার— জোরে চিৎকার করা, গর্জন। আলশে— কার্নিস। বিষন্ন— দুঃখিত, মনখারাপ। অপার্থিব—অলৌকিক,অবাস্তব। নির্বিকার—উদাসীন, ভাবলেশহীন। অধীর— অস্থির, চঞ্চল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়— কী করা উচিত ঠিক করতে না পারার অবস্থা। স্পেন— ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ। উদ্ভাসিত— উজ্জ্বল আভাযুক্ত। কলজে—'কলিজা' শব্দ থেকে এসেছে, হৃৎপিন্ড।

৩. নীচের বাক্যাংশগুলি কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেছে লেখো:

৩.১ বাতাস ছুটে এসে বদ মেজাজ ঝাপট মারত।

৩.২ জামাকাপড় জুবজুবে।

৩.৩. বৃষ্টির ভয়ানক হাতুড়ি পড়তে লাগল।

৩.৪. তার মুখ উদ্ভাসিত।

৩.৫ ভার্ন ড্যাবড্যাব করে চায়।

৪. নীচের বিশেষ্যগুলি বিশেষণে আর বিশেষণগুলি বিশেষ্যে বদলে বাক্য রচনা করো :

গোমরা, হুজুগে, চিৎকার, সাহসী, অভিনব।

৫. নীচের বাক্যগুলিতে কোন কোন শব্দে বচন কীভাবে নির্দেশিত হয়েছে তা লেখো :

৫.১ ওরা হাসছে।

৫.২ ঝুলে-পড়া মেঘগুলো ঘন কালো হয়ে উঠত।

৫.৩ অ্যামি আমাদের উঠোনে।

৫.৪ এমন সময় কলজেটা যেন লাফ দিয়ে উঠল।

৫.৫ পকেট থেকে একটা পেনি বার করে বলে ‘টস কর’।

৬. নিম্নরেখ অংশের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

৬.১ সবে দৌড়ে ফিরেছি বৃষ্টি থেকে ।

৬.২ আর মুখ একেবারে ভেজা।

৬.৩ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

৬.৪ আমি ছিটকে চলে গেলাম খাটের তলায়।

৬.৫ ভার্ন রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে।

৭. নীচের বাক্যগুলি থেকে উপযুক্ত প্রশ্ন তৈরি করো :

৭.১ রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে ওদের যত আনন্দ, ঝমঝম বৃষ্টিতেও যেন তত।

৭.২ ভার্ন আলশের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল।

৭.৩ আবার কী ভয়ংকর বজ্রপাতের শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল।

৭.৪ দৌড়ে যাই যেখানে ভার্নের ব্যাট আর বল রেখেছিলাম।

৭.৫ আমি অনেকবার ঠিক করেছি সাহসী হব, কিন্তু যখনই বাজ পড়ত অমনি ছিটকে ঢুকতাম খাটের তলায়।

৮. উদ্ধৃতি চিহ্ন পরিহার করে বাক্যগুলি নিজের ভাষায় লেখো :

৮.১ ‘আমি দু-নম্বর ব্যাট’, ভার্ন বলে।

৮.২ সে বলে সেলো, ব্যাট আর বল কোথায়?

৮.৩ ‘ভার্ন’, সে চেঁচিয়ে ডাকে,‘ এই ভার্ন, দ্যাখ, সেলো!’

৯. কোনটি কোন দেশের মুদ্রা উল্লেখ করো :

পেনি, ডলার, পেসো, রুবল, টাকা।

১০. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১০.১ তোমার রাজ্যের কোন দিকে সমুদ্র রয়েছে?

১০.২ খেলাধূলা নিয়ে লেখা তোমার পড়া বা শোনা একটি গল্পের নাম লেখো।

১০.৩ ঘরের ভিতরের ও বাইরের দুটি খেলার নাম লেখো।

১০.৪ তোমার রাজ্যের একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লেখো।

১০.৫ তোমার জানা ঋতু বিষয়ক যে কোনো একটি ছড়ার প্রথম পংক্তি লেখো।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির দু/একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ মাঠের খেলাধূলার সঙ্গে রাস্তার খেলাধূলার ফারাকগুলি লেখো।

১১.২ সমুদ্রের ধারে ঝড় কীভাবে ভয়ংকর হয়ে ওঠে?

১১.৩ গল্পে মোট কটি কিশোর চরিত্রের সন্ধান পেলে? গল্পের একমাত্র বয়স্ক চরিত্রটি কে?

১১.৪ সেলো ভার্নের ব্যাট বল কেন ও কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল?

১১.৫ তাদের বিবাদ কীভাবে মিটে গেল?

১২. রাস্তায় ক্রিকেট খেলা গল্পটি পড়ে কোন কোন অনুষঙ্গে মনে হলো যে গল্পটি বিদেশি গল্প?

১৩. তোমার নিজের চেনা পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে গল্পের মিলগুলো সূত্রাকারে লেখো। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে দেশটির অবস্থান দেখে নাও।

‘নেবুর পাতায় করমচা / হে বৃষ্টি ধরে যা’ প্রচলিত ছড়ার এই অংশটুকুর উল্লেখ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে। যা উপন্যাসের ‘আম আঁটির ভেঁপু’ অংশের অন্তর্গত। ‘সিগনেট’ প্রকাশিত ‘আম আঁটি ভেঁপু’ বইটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই ছড়ার অংশটুকু রয়েছে।

দিন ফুরোলে

শঙ্খ ঘোষ

সূয্যি নাকি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে? সন্ধে হলো? দুচ্ছাই
আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।
লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো
কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!
আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ?
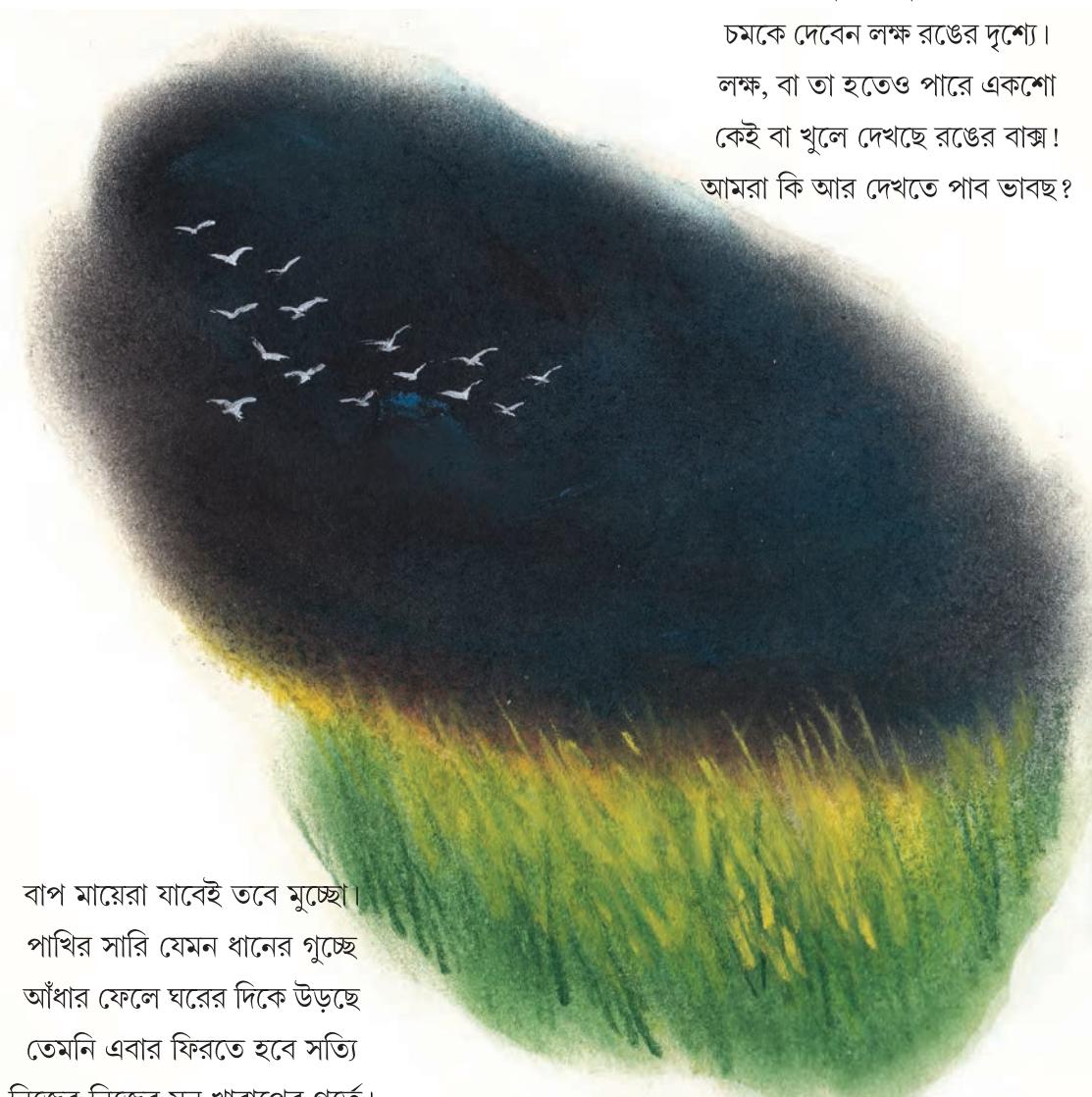
বাপ মায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।
পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে
তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন খারাপের গর্তে।
বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্ছা
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না? আচ্ছা!
মা বলবে, ঠ্যাং দুটো কী কুচ্ছিৎ।
এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

১. কবিতাটিতে ‘চ্ছ’ দিয়ে কতগুলি শব্দ আছে লেখো, প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহার করে একটি করে আলাদা বাক্য লেখো।

২. **নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :**

৩. ‘লক্ষ’ -শব্দটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি পৃথক বাক্য লেখো। ‘লক্ষ্য’ শব্দটির সঙ্গে এই দুটি অর্থের পার্থক্য দেখিয়ে আরও একটি নতুন বাক্য লেখো।

৪. ‘এক গঙ্গা জল’ — শব্দবন্ধটির মানে ‘গঙ্গায় যত জল ধরে সব’ অর্থাৎ কিনা অনেকখানি জল। নীচের স্তম্ভদুটির ডানদিক ও বামদিক ঠিকভাবে মেলাতে পারলে আরো কিছু এরকম শব্দবন্ধ তৈরি করতে পারবে।

এক মাথা	হাসি
এক ক্লাস	আম
এক আকাশ	ধুলো
এক ঘর	ধান
এক কাঁড়ি	পায়েস
এক ঝুড়ি	ছাত্র
এক হাঁড়ি	তারা
এক মুঠো	টাকা
এক মুখ	লোক
এক কাহন	চিনি

৫. নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্যরচনা করো :

সূয্যি, দৃশ্য, বাক্স, বাপ-মা, গর্ত, ঠ্যাং, গাদা, ঘর, ধান, জল।

শব্দার্থ: দুচ্ছাই—দূরছাই , অবজ্ঞা ও বিরক্তিসূচক ধ্বনি। ঠ্যাং—পা। মুচ্ছো—মূর্চ্ছা, চৈতন্যলোপ। কুচ্ছিৎ—কুৎসিত, বিশ্রী।

৬. নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে বের করো :

বারি, অরুণ, অম্বর, পেটিকা, অজ্ঞান, গোছা, বিষাদ, কন্দর, পা, বিশ্রী।

৭. নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নাও :

ভালো, মিথ্যা, বাইরে, বুড়ো, সুশ্রী।

৮. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

৮.১ চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।

৮.২ বাপ মায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো।

৮.৩ কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স।

৮.৪ নিজের নিজের মন খারাপের গর্তে।

৮.৫ এক গঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৯৩২) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিনগুলি রাতগুলি’। এছাড়াও লিখেছেন ‘নিহিত পাতাল ছায়া’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— ‘ছোট্ট একটা স্কুল’, ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’, ‘শব্দ নিয়ে খেলা’, ‘সকালবেলার আলো’, ‘সুপুরিবনের সারি’, ‘শহর পথের ধুলো’ ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই হিসেবে ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক’, ‘ছন্দোময় জীবন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৯. এক কথায় উত্তর দাও :

৯.১ সূয্যি ডুবে যাওয়ায় কথকরা ‘দুচ্ছাই’ বলছে কেন?

৯.২ কে এক্ষুণি আকাশ জুড়ে লক্ষ রঙের দৃশ্যে চমকে দেবেন?

৯.৩ কথকরা কেন সেই দৃশ্য দেখতে পাবে না?

৯.৪ কথকরা কেন বলেছে, ‘কেই বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!’?

৯.৫ বাপ মায়েরা কী হলে ‘মুচ্ছো’ যাবেন?

৯.৬ পাখিরা কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়?

৯.৭ কথকরা কেন বলেছে তাদের ‘নিজের নিজের মনখারাপের গর্তে’ ফিরতে হবে?

৯.৮ বাবা কী বলবেন?

৯.৯ মা-ই বা বাড়ি ফিরলে কী বলবেন?

৯.১০ কথকরা কেন ‘এক গঙ্গা জল দিয়ে’ পা ধুচ্ছে?

১০. ব্যাখ্যা করো :

১০.১ “সূয্যি নাকি.......ডুব দিয়েছে?”

১০.২ “আকাশ জুড়ে.......লক্ষ রঙের দৃশ্য।”

১০.৩ “লক্ষ, বা তা হতেও পারে........রঙের বাক্স!”

১০.৪ “আমরা কি আর.........যাবেই তবে মুচ্ছো।”

১১. আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ কবিতাটি অবলম্বনে তোমার দেখা একটি গোধূলির রূপ বর্ণনা করো।

১১.২ কবিতাটিতে ছোটো ছেলেমেয়েদের কাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? সন্ধেবেলায় ঘরে ফেরাকে ‘মনখারাপের গর্তে’ ফেরা বলে কেন মনে হয়েছে? খেলা থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার দুঃখ নিয়ে তোমার অনুভূতি লেখো।
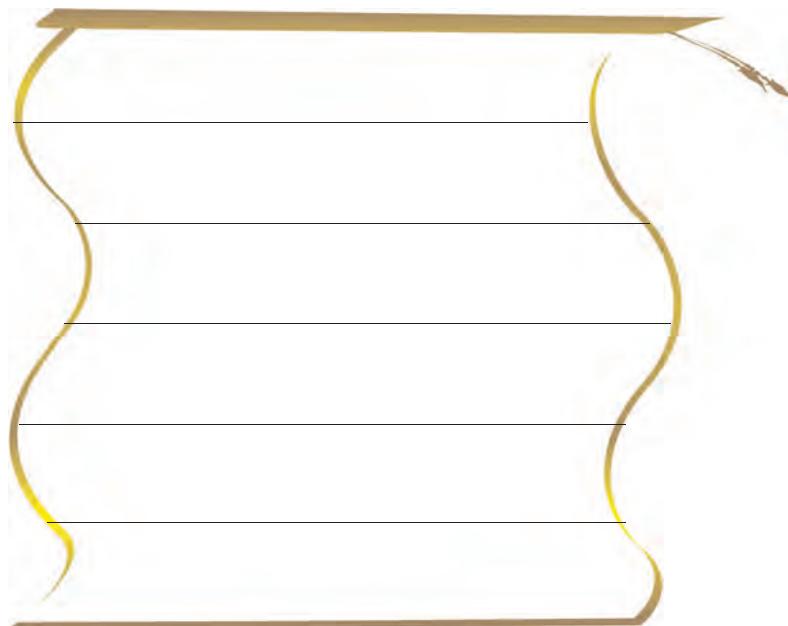
জাদুকাহিনি

অজিতকৃষ্ণ বসু

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জাদুকর ডেভিড ডেভান্ট একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি জনবিরল পথ দিয়ে একা বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি জোয়ান চেহারার লোক তাঁকে পাকড়াও করে বললে 'এই যে মশাই। অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি আপনাকে। আপনিই না টাকা বানান?'

ডেভান্ট একটু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা বলে কী ? একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন, আপনি বোধহয় ভুল করছেন।'

লোকটি বললে, 'মোটেই ভুল করিনি। আমার এই টুপিটি শিলিং দিয়ে ভরে দিয়ে যাবেন, তার আগে আপনাকে ছাড়ছিনে।' বলে মাথা থেকে টুপিটি নামিয়ে চিৎ করে ধরলে ডেভান্টের সামনে।

ডেভান্ট বুঝলেন পালাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না, দৌড়ে বা কুস্তিতে এ লোকটার সঙ্গে পারবেন না তিনি। কাল সন্ধ্যা, পথ নির্জন, চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেবার লোক নেই কাছাকাছি। সুতরাং লোকটিকে চটানো চলবে না। ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হবে। ডেভান্ট বললেন, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পকেটখানা তল্লাসি করে যা পাও সব নিয়ে নাও।'

‘কত আছে তোমার পকেটে?’ প্রশ্ন করল লোকটি।

ডেভান্ট বললেন, ‘ছয় শিলিং।’

লোকটি বললে, ‘ছোঃ! ও তো আমার টুপির তলায় এক কোণে পড়ে থাকবে। টুপিটা ভরে দিতে হবে বলছি না? আপনি হাওয়া থেকে ঝপাঝপ টাকা ধরেন, নিজের চোখে দেখেছি। আমার কাছে চালাকি?’

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেভান্টের কাছে। একটি জাদুর খেলা আছে যার নাম ‘কৃপণের স্বপ্ন’ (Miser’s Dream) অথবা ‘হাওয়াই টাঁকশাল’ এ খেলায় বারবার হাত খালি দেখিয়ে জাদুকর হাওয়া থেকে টাকা ধরে-ধরে পাত্র ভরে ফেলেন। টাকাগুলো অবশ্য হাওয়া থেকে আসবে না। খেলাটি নির্ভর করে প্রধানত পামিং (Palming) বা হাতের তালুতে এক বা একাধিক টাকা লুকিয়ে রাখা এবং গুপ্তস্থান থেকে টাকা নেওয়ার কৌশলের ওপর। ডেভান্ট বুঝলেন এই লোকটি কোনোদিন তাঁর এই খেলাটি দেখেছে আর ভেবে নিয়েছে সত্যিই হাওয়া থেকে টাকা ধরবার অলৌকিক জাদু তাঁর করায়ত্ত। ডেভান্ট লোকটিকে বোঝাতে গেলেন ; লোকটি খেপে উঠে বললে, ‘ভারি বেয়াড়া, বেআক্কেল, বেদরদি লোক তো আপনি মশাই। চোখের সামনে দেখছেন অর্থাভাবে শুকিয়ে মরছি, আর আপনি হাত বাড়ালেই আঙুলের ডগায় টাকা এসে পড়ে তবু হাতটুকু বাড়াবার মেহনত করতে চান না। ভালো চান তো চটপট শুরু করুন। আর দেরি নয়।’

ডেভান্ট বুঝলেন, লোকটি গুন্ডা, গোঁয়ার অথবা পাগল ; এতক্ষণ শুধু মুখ চালাচ্ছিল, এইবার হাত চালাবে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে তিনি কাজে লেগে গেলেন ; কিছুক্ষণ জাদুকরসুলভ ভঙ্গিতে হাওয়ায় হাত চালিয়ে হাওয়া থেকে একটি শিলিং ধরে লোকটির টুপির ভিতর ফেলে দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে বললে, ‘বাঃ এই তো চমৎকার পেরেছেন। নিন, জলদি হাত চালান। টুপিটা পুরো ভর্তি করে দিতে হবে যে’।

ডেভান্ট ছোটো বড়ো অনেক আসরে জাদুর খেলা দেখিয়েছেন, কোনোদিনও কল্পনাও করেননি বিজন পথে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র দর্শকের সামনে এ হেন অসহায়ভাবে তাঁকে জাদু-প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গে মাত্র ছয়টি শিলিং, হাওয়া থেকে ছয় শিলিং-এর বেশি ধরা তাঁর জাদুবিদ্যায় কুলোবে না। বিপদ শুরু হবে তারপরই, কারণ মাত্র ছয় শিলিং দিয়েই লোকটির টুপি ভরবে না, মনও ভরবে না। শেষটায় কি ঐ গোঁয়ারের হাতে মার খেয়ে মরতে হবে? হাওয়া থেকে টাকা ধরার কাজটিকে তিনি নানা কায়দায় যথা সম্ভব বিলম্বিত করতে লাগলেন, যেন লোকজন এসে পড়ার আগেই সবগুলো শিলিং ফুরিয়ে না যায়।

ডেভান্টের ভাগ্য ভালো, তিনি হাওয়া থেকে লোকটিকে চার শিলিং ধরে দিয়ে আরো বিলম্বিত লয়ে পঞ্চম শিলিং ধরবার তোড়জোড় করছেন, বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে উদ্বেগে, এমন সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই চার-পাঁচ জন লোক এসে হাজির। তারা এই লোকটির খোঁজেই বেরিয়েছিল—লোকটির মাথা খারাপ। ডেভান্টের বেকায়দায় দুঃখ প্রকাশ করে তারা তাদের হারানিধিকে নিয়ে চলে গেল। ডেভান্ট হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বিখ্যাত জাদুকর ডেভান্টের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে একজন অখ্যাত জাদুকরের বিচিত্র কাহিনি মনে পড়ে গেল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি। চাঁদ মিয়া নামে একজন জাদুকর স্কুলের বড়ো হলে আমাদের জাদুর খেলা দেখালেন। বেশি খেলার পুঁজি ছিল না ভদ্রলোকের, ঘণ্টাখানেক খেলা দেখিয়েছিলেন তিনি। এখনকার চোখে তাঁর খেলা কেমন লাগত জানি না, তখন মন্দ লাগেনি। হাওয়া থেকে একটি-একটি করে টাকা ধরে তাঁকে একটি টিনের কৌটা ভরে ফেলতে দেখে আমরা সবাই বেশ

বিস্মিত হয়েছিলাম ; ভাবছিলাম এভাবে হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার বিদ্যেটা জানা থাকলে কি ভালোই না হতো! তাহলে টাকার জন্য কোনো ভাবনা থাকত না।

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের মনে একটু খটকাও লেগেছিল। জাদুকরের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য আমরা ছাত্রেরা এক আনা করে টিকিট কিনেছিলাম এবং প্রধান শিক্ষক মশাই কিছু চাঁদা দিয়েছিলেন। তাতে মোট দশ টাকার বেশি হয়নি, কিন্তু তাই পেয়েই জাদুকর চাঁদ মিয়া এত খুশি হয়েছিলেন যে, বোধহয় পাঁচ টাকা পেলেও তিনি অখুশি হতেন না। এ ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া লেগেছিল। হাওয়া থেকে খুশিমতো টাকা ধরবার জাদু যাঁর জানা আছে তিনি হাওয়াই টাকায় কোটিপতি না হয়ে দীনহীনের মতো এই সামান্য টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান কেন? এ প্রশ্নের ভারি সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন জাদুকর চাঁদ মিয়া। বলেছিলেন, 'হাওয়াই জাদুর টাকা ভোগে লাগাতে নেই। লাগালেই জাদু আর লাগে না। হাওয়ার টাকা তাই আবার হাওয়াতেই ফিরিয়ে দিতে হয়।'

অজিতকৃষ্ণ বসু (১৯২২—১৯৯৩) : অ.কৃ.ব নামে বিখ্যাত এই লেখক সংগীত, সাহিত্য ও জাদুবিদ্যা—পারদর্শী ছিলেন এই তিনটি ক্ষেত্রেই। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষত ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের কবিতা এবং কৌতুকপ্রধান কথাসাহিত্য রচনার জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁর 'পাগলা গারদের কবিতা' সিরিজ বা 'শঙ্করস উইক্‌লি'তে মুদ্রিত তাঁর বহু কৌতুক রচনা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর উদ্ভট খাপছাড়া কবিতাগুলি Lunarics নামে পরিচিত। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি হলো 'খামখেয়ালী ছড়া', 'আজব ছড়া', 'ছড়ার মিছিল' প্রভৃতি। সংগীত জীবনের নানা কথা ও কাহিনি তিনি বিবৃত করেছেন 'ওস্তাদ কাহিনী' গ্রন্থে। মঞ্চে কখনো জাদু প্রদর্শন না করলেও, তাঁর বন্ধু জাদুসম্রাট পি.সি.সরকারের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দীর্ঘ দিন জাদুচর্চা করেছেন তিনি। জাদুকরদের বিচিত্র জীবন ও নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর 'যাদুকাহিনী' বইটি ১৯৪৬ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছে 'নরসিংহদাস পুরস্কার'।

গাধার কান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাউন স্কুলের সঙ্গে মিশন স্কুলের ফুটবল ম্যাচ—কাপ ফাইনাল। শহরের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে—এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি ; তাই আজকের খেলাটা যে খুব জমবে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁচটা থেকে খেলা আরম্ভ হবে, কিন্তু চারটে বাজতে-না-বাজতেই মাঠে লোক জমতে আরম্ভ করেছে। দুই স্কুলের ছেলেরা মাঠের দু-ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুপক্ষের খেলোয়াড়েরা এখনো

মাঠে দেখা দেয়নি, তারা রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে।

খেলার মাঠ থেকে কিছু দূরে একটা বটগাছের তলায় টাউন স্কুলের ছেলেরা তৈরি হচ্ছিল। গিরীন তাদের ক্যাপটেন ; সে হাফ্-প্যান্টে কোমরবন্ধ বাঁধতে-বাঁধতে বললে, 'আরো পনেরো মিনিট বাকি, এখনও সমরেশ ফিরল না। আজ সর্বনাশ হলো দেখছি!'

টুনু টাউন স্কুলের একজন খেলোয়াড়; দেখতে অতি ক্ষীণ। সে জার্সির মধ্যে মাথা ঢোকাতে-ঢোকাতে জিজ্ঞেস করলে, 'সমরেশদা কোথায় গেছে?'

প্রণব সাজসজ্জা শেষ করে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল। তার কপালে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি ; সে বললে, 'সমরেশ তুক্ করতে গেছে।'

টুনু একে ছেলেমানুষ, তায় সবে এ-বছর থেকে স্কুল-টিমে স্থান পেয়েছে, সে ভেতরকার সব কথা জানত না। অবাক হয়ে বললে, 'তুক্ কীসের পানুদা?'

প্রণব বিরক্ত হয়ে বললে, 'জানিস না, খেলার আগে গাধার কান না মললে আমরা হেরে যাই।'

টুনু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ!'

'ঠাট্টা?' প্রণব চোখ পাকিয়ে বললে, 'তোর সঙ্গে আমি ঠাট্টা করব?' বলে টুনুর কানের দিকে হাত বাড়ালে।

টুনু তাড়াতাড়ি কান সরিয়ে নিয়ে বললে, 'তবে কি সত্যি সমরেশদা গাধার কান মলতে গেছে?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি?'

'হিঃ-হিঃ-হিঃ, গাধার কান—!' টুনু হঠাৎ হেসে উঠল।

গিরীন ভুরু কুঁচকে বললে, 'হাসছিস যে! গাধার কান মলা হাসির কথা নাকি? গেল বছর গাধার কান মলে আমরা কাপ জিতেছি ; তার আগের বছর গাধা পাওয়া গেল না—'

এই সময় হন্তদন্তভাবে সমরেশ এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী হলো, কী হলো?'

সমরেশের চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো ; সে বিমর্ষভাবে বললে, পেলুম না। শহরে কোথাও একটি গাধা নেই। সেই বেলা একটা থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

'ঘাটে খুঁজেছিলি?'

'ঘাটে, মাঠে, ধোবার বাড়িতে—কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি। নো গাধা। আশ্চর্য, আজকের দিনেই গাধাগুলো লোপাট হয়ে গেল।'

সকলের মুখেই বিপদের ছায়া পড়ল। গিরীন বললে, 'আর কী হবে। নে সমরেশ শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নে—আর সময় নেই।'

সমরেশ বিষণ্ণমুখে জার্সি পরতে লাগল ; কারণ গাধা পাওয়া যাক আর না যাক, খেলতে তো হবেই! সমরেশ বেচারা সারা দুপুর গাধার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ গাধা খুঁজে পায়নি ; তাই দুঃখটা তার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। বিশেষত আজ মিশন স্কুলের খেলা ; মিশন স্কুলকে হারাবে বলে তারা প্রাণপণ

প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু গাধার কান মলা হলো না! তার মানে—মিশন স্কুলকে তারা হারাতে পারবে না। আহা! একটা গাধার বাচ্চাও যদি পাওয়া যেত!

সমরেশ পায়ে অ্যাঙ্কলেট আঁটতে-আঁটতে এই কথা ভাবছিল এমন সময় তার কানে 'খিক্-খিক্' শব্দ এল। সে মুখ তুলে দেখলে, টুনু দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। সমরেশ কড়া সুরে বললে, 'হাসছিস কেন রে টুনু? টুনুর সবকথাতেই হাসি—শুনলে এত রাগ হয়!'

হাসি চাপবার চেষ্টায় টুনুর চোখে জল এসে পড়েছিল, সে মুখ তুলে বললে, 'না সমরেশদা,'—বলেই জোরে হেসে ফেললে,—'হিঃ-হিঃ, সমরেশদা, তুমি সারা দুপুর গাধার কান মলবার জন্য ঘুরে বেড়ালে, আর একটাও গাধা পেলে না! হিঃ-হিঃ—তুক্ করা হলো না!'

সমরেশ লাফিয়ে গিয়ে টুনুর কান ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে বললে, 'হাসি! তুক্ করার নামে হাসি! ছুঁচো কোথাকার! আজ আমরা হেরে যাব, আর হাসি হচ্ছে?'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে টুনু বললে, 'কে বললে হেরে যাব?'

'বলবে আবার কে? আমরা সবাই জানি, যখন গাধা পাওয়া যায়নি—'

'কখ্খনো না—দেখে নিয়ো! কান ছেড়ে দাও, লাগছে!'

গিরীন বললে, 'ছেড়ে দে সমর, খেলার আগে আর কিছু বলিসনি। কিন্তু যদি হেরে যাই—'

এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল।

* * *

দুই পক্ষের খেলোয়াড়রা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালো। রেফারি দিব্যেন্দুবাবুকে দেখে টুনু গিরীনের কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করে বললে, 'ও গিরীনদা, রেফারি যে দিব্যেন্দুবাবু!'

দিব্যেন্দুবাবুকে বাঁশি হাতে দেখে গিরীনও দমে গিয়েছিল, তবু সে বললে, 'তাতে কী হয়েছে?'

'দিব্যেন্দুবাবু যে জিলিপি খায়!'

'চুপ্!'

স্কুলের ছেলেরা সবাই জানত যে, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি খেতে বড়ো ভালোবাসেন ; আর ম্যাচের আগে যে-পক্ষ তাঁকে জিলিপি খাওয়ায়, তিনি সেই পক্ষকে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। যাহোক, এখন তো আর উপায় নেই, মিশন স্কুলের ছেলেরা নিশ্চয় তাঁকে পেট ভরে জিলিপি খাইয়েছে। টাউন স্কুলের খেলোয়াড়গণ আরও মুষড়ে গেল।

দিব্যেন্দুবাবু টস্ করলেন। গিরীন ব্যাকে খেলে, সমরেশ খেলে হাফ-ব্যাক থেকে ; আর টুনু রাইট-ইন। তাদের দলের বাকি ছেলেরাও বেশ ভালো খেলে, কিন্তু এই তিনজনের উপরেই ভরসা। টুনু ছেলেটি রোগা-পটকা, কিন্তু বল তার পায়ে পড়লে তাকে আটকানো শক্ত। দৌড়াতে পারে সে ঠিক হরিণের মতো!

মিশন স্কুলের দলও খুব মজবুত। তারা বেশির ভাগ বুট পরে খেলে, গায়ে জোরও বেশি ; কাজেই দুই দলের মধ্যে কারা জিতবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।

প্রথম মিনিট-দশেক মিশন স্কুল চেপে রইল—বল আর টাউন স্কুলের গোলের কাছ থেকে দূরে যায় না। গিরীন আর সমরেশ প্রাণপণে বল বের করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তবু গোল বাঁচাতে-বাঁচাতে গোল-কিপার প্রশান্ত হিমসিম খেয়ে গেল। দু'বার কর্নার হলো ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে গোল হলো না। তারপর একবার একটু ফাঁক পেয়ে সমরেশ বল বের করে দিল। বল গিয়ে টুনুর পায়ে পড়ল।

বল পেয়ে টুনু একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলে, তারপর বল নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটল। মিশন স্কুলের হাফ-ব্যাকেরা সব এগিয়ে গিয়েছিল, কাজেই ব্যাক আর গোল-কিপার ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।

ব্যাক—এরিয়ার মধ্যে পৌঁছাতেই একজন ব্যাক তেড়ে এল ; টুনু বলটি টুক করে সেন্টার-ফরোয়ার্ড রণজিতের পায়ের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে এগিয়ে এল। তখন দ্বিতীয় ব্যাক রণজিতকে চার্জ করলে রণজিৎ আবার বলটি টুনুর পায়ে এগিয়ে দিলে। সামনে আর ব্যাক কেউ নেই, শুধু গোল-কিপার। টুনু বল নিয়ে তিরের মতো গোলের পানে দৌড়োল।

কিন্তু বল গোলে শূট করবার আগেই ব্যাক দু'জন পিছন থেকে দুটো দৈত্যের মতো হুড়মুড় করে টুনুর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। একজন মারলে টুনুর পায়ে বুটসুদ্ধ এক লাথি। টুনু তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল; অমনি দ্বিতীয় ব্যাক বল কিক করে বের করে দিলে।

দিব্যেন্দুবাবুর বাঁশি বাজল। টুনু গড়াতে-গড়াতে উঠে বসে ভাবলে, নিশ্চয় দিব্যেন্দুবাবু ফাউল দিয়েছেন। পেনাল্টি !

কিন্তু হায়, দিব্যেন্দুবাবু পেনাল্টি দিলেন না ; উল্টে টাউন-স্কুলের বিরুদ্ধে অফসাইড দিলেন। রণজিৎ নাকি অফসাইডে ছিল।

আবার খেলা চলতে লাগল। টুনুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে বিষম লেগেছিল, সে ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে গিয়ে গিরীনকে বললে, 'দেখলে গিরীনদা, দিব্যেন্দুবাবু জিলিপি—'

গিরীন বললে, 'এখন ওসব কথা নয়, নিজের জায়গায় যা। দিব্যেন্দুবাবু যা খুশি করুন, আজ তোকে গোল দিতে হবে মনে থাকে যেন।'

ছলছল চোখে টুনু বললে, 'কিন্তু আমার বুড়ো-আঙুলটা ভেঙে গেছে যে—'

গিরীন বললে, 'তা যাক। কিন্তু গোল দেওয়া চাই-ই।'

টুনু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। খেলা তখন বেশ জোর চলছে ; একবার এ-দল গোলের কাছে বল নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও-দল নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে হাফ-টাইমের সময় এগিয়ে আসতে লাগল ; আর পাঁচ মিনিট বাকি। টুনু আরো দু'একবার বল পেলে ; কিন্তু বেচারার পা বেজায় ব্যথা করছিল। সে বেশি দৌড়তে পারলে না। বল আর-একজনকে পাস করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ মিশন স্কুল একটা গোল দিল। তাদের পাঁচজন ফরোয়ার্ড একসঙ্গে বল নিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে গেল, কেউ তাদের আটকাতে পারলে না।

আবার খেলা আরম্ভ হলো। একটা গোল দিয়ে মিশন স্কুলের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, তারা দুর্দান্তভাবে খেলতে লাগল। আবার গোল হয়-হয়।

কিন্তু আর গোল হবার আগেই হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

হাফ-টাইম হলে গিরীন এসে বললে, 'টুনু, তোর পায়ে কী হয়েছে দেখি?'

খেলোয়াড়রা মাঠের মঝেখানেই গোল হয়ে বসেছিল। কেউ বরফ খাচ্ছিল, কেউ লেবু চুষছিল ; টুনু আঙুলে বরফ চেপে বসেছিল, আস্তে-আস্তে পা বার করে দিলে।

'কই, কী হয়েছে?' বলে গিরীন আঙুল ধরে টান দিলে।

'উঃ-উঃ—ছেড়ে দাও গিরীনদা, বড্ড লাগছে—আঙুলের মাথাটা একেবারে মটকে গেছে!'

'ও কিছু নয়—এই দ্যাখ্ আমার কী হয়েছে।'

টুনু দেখলে, গিরীনের হাঁটুর নীচে ঠিক কথ্‌বেলের মতো ফুলে উঠেছে। সে বললে, 'উঃ, খুব ব্যথা করছে!'

'দূর! খেলার সময় কি আর ওসব মনে থাকে!' তারপর টুনুর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গিরীন বললে, 'টুনু, আজ তুই-ই ভরসা। একটা গোলে হেরে আছি, সে কিছুই নয়; তুই যদি চেষ্টা করিস তাহলে তিনটে গোল দিতে পারিস।'

টুনুর বুক ফুলে উঠল, সে বলল, 'পারব! কিন্তু পায়ের ব্যথায় যে দৌড়াতে পারছি না—'

'পায়ের ব্যথা ভুলে যা—শুধু মনে রাখ, আজ আমাদের জিততেই হবে।'

উৎসাহে ও উত্তেজনায় টুনুর গলা কেঁপে গেল, সে শুধু বললে, 'আচ্ছা—'

* * *

হাফ-টাইমের পর আবার খেলা আরম্ভ হলো।

এবার খেলা শুরু হতে-না-হতেই টুনুর কাছে বল গেল। পায়ের ব্যথা ভুলে টুনু বল নিয়ে দৌড়োল। এবার তার প্রতিজ্ঞা সে গোল দেবেই। দু'জন হাফ-ব্যাক টুনুকে আক্রমণ করলে ; তাদের পাশ কাটিয়ে বল নিয়ে আবার দৌড়োল।

সামনে দু'জন হুম্‌দো ব্যাক। টুনু কী করে, ব্যাক দুজনের মাথার উপর দিয়ে বল তুলে দিয়ে আবার ছুটল। বলটা পড়েছিল ঠিক গোল-কিপার আর টুনুর মাঝামাঝি; দু'জনেই বল ধরবার জন্যে ছুটে গেল। দু'জনের মধ্যে লাগল ভীষণ ঠোকাঠুকি। টুনু বেচারি উল্টে পড়ে গেল।

বলটা কিন্তু গড়াতে-গড়াতে গিয়ে গোলে ঢুকল।

'গোল! গোল!' দর্শকের এক অংশ বিরাট চিৎকার করে উঠল ; অন্য অংশ চুপ করে রইল। কিন্তু এবার আর অফসাইড বলবার জো নেই, টুনু একলা গোল দিয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু গোল দিলেন।

টুনু এই ফাঁকে গিরীনকে বলে এল, 'গিরীনদা, আঙুল ঠিক হয়ে গেছে!'

গিরীন তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'সে কী রে, কী করে ঠিক হলো?'

'ঐ যে গোল-কিপারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ; ব্যস, ঠিক হয়ে গেছে।'

এবার ঝড়ের মতো খেলা আরম্ভ হলো। মিশন স্কুলের ছেলেরাও ভালো খেলোয়াড়, তারা প্রাণপণে খেলতে লাগল। তাদের একটা দোষ, হারবার উপক্রম হলেই তারা মারামারি করে খেলতে আরম্ভ করে। কিন্তু মারামারি করে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না ; কারণ টাউন স্কুলের ছেলেরা এমনভাবে খেলে যে, গায়ে গা ঠেকে না—তাদের মারতে গেলে তারা পিছলে বেরিয়ে যায়। ফলে যারা মারতে যায় তাদেরই অসুবিধা হয় বেশি ;—মারতেও পারে না, অথচ খেলা খারাপ হয়ে যায়।

টুনু এবার অদ্ভুত খেলা খেলতে আরম্ভ করলে। তাকে পাঁচজন লোক ঘিরে থাকে, তবু আটকাতে পারে না। একে তার ছোট্ট শরীর, তার উপর তিরের মতো ছুটতে পারে। তাই তাকে আটকাতে গেলেই সে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যায়। তার খেলা দেখে মিশন স্কুলের ছেলেরা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! এইটুকু ছেলে—তার এ কী আশ্চর্য খেলা!

দেখতে-দেখতে টুনু আর একবার বল নিয়ে দৌড়াল। এবার ব্যাক দু'জন এমনভাবে তার সামনে দাঁড়ালো যে, একজনকে কাটিয়ে বেরুতে গেলেই আরেক একজনের সামনে পড়তে হয়। টুনু বলটি চট করে রণজিৎকে পাস করে দিলে। রণজিতের দিকে কারও নজর ছিল না, সবাই টুনুকে নিয়ে ব্যস্ত। রণজিৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গোলের কোণ ঘেঁষে বল মারলে। গোল-কিপার শুয়ে পড়ে বল ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ধরতে পারলে না।

শব্দ উঠল—'গোল! গোল!'

দ্বিতীয় গোলের পর মিশন স্কুল একেবারে দমে গেল। গোল খেয়ে যারা দমে যায় তারা আর জিততে পারে না। তাদেরও তাই হলো। টুনু তখন আরও দুটো গোল ঠুকে দিলে।

খেলা যখন শেষ হলো তখন টাউন স্কুল দিয়েছে চার গোল, আর মিশন স্কুল মোটে এক গোল।

* * *

খেলার পর ছেলেরা এক জায়গায় জটলা করছিল। হঠাৎ শানু বলে উঠল, 'আচ্ছা, আজ আমরা জিতলুম কী করে? গাধার কান মলা তো হয়নি!'

সকলে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না। সত্যিই তো! এ-রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে?

সমরেশ হঠাৎ জোরে হেসে উঠল, 'বুঝেছি!'

সকলে বলে উঠল, 'কী! কী!'

সমরেশ বললে, 'মনে নেই! খেলার আগে টুনুর কান মলে দিয়েছিলুম! তাতেই গাধার কান মলার ফল হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল। শানু বললে, 'বেশ হয়েছে। এবার থেকে টুনুর কান মলে খেলতে নামলেই চলবে। আর গাধা খুঁজে বেড়াতে হবে না।'

গিরীন হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'সে আসছে বছর দেখা যাবে। আজ টুনুই আমাদের হিরো!' এই বলে টুনুকে দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'বল থ্রি চিয়ার্স ফর টুনু! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!'

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ ‘শহরের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে’— এই ‘সাড়া পড়ার’ কারণ কী?

১.২ ‘এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের রেষারেষি’— কোন দুই স্কুলের কথা বলা হয়েছে?

১.৩ ‘হিঃ হিঃ— তুক্ করা হলো না’— বক্তা কে? কাকে সে একথা বলেছে? কখন বলেছে?

১.৪ গল্পে ফুটবল খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু শব্দ রয়েছে, যেমন— হাফ-ব্যাক, রাইট-ইন, গোলকিপার, সেন্টার ফরোয়ার্ড, ব্যাক-এরিয়া ইত্যাদি। আরো কিছু শব্দ তুমি গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। এছাড়াও নিজস্ব কিছু সংযোজনও করতে পারো।

২. নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে :

ভুরু, গাধা, দুপুর, চোখ, বাঁশি, পাঁচ।

৩. **পদ-পরিবর্তন করো :** সন্দেহ, সজ্জিত, সর্বনাশ, উপস্থিত, মজবুত, শব্দ।

শব্দার্থ : রেষারেষি — বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাতার—শ্রেণি, পঙ্‌ক্তি। রণসজ্জা—যুদ্ধের বেশ/সাজ। কোমর বন্ধ—কোমরে বাঁধার পটি, বেল্ট। তুক—জাদুমন্ত্র, বশীকরণের প্রকরণ। হন্তদন্ত—ব্যস্তসমস্ত, অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত। উস্কোখুস্কো—রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। বিমর্ষ—দুঃখিত, বিষণ্ণ। লোপাট—নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত। বিষণ্ণ—দুঃখিত, ম্লান। বিদ্যুৎবেগে—অতি দ্রুত বেগে। ভ্যাবাচাকা—হতবুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা। জটলা—বহুলোকের একত্র সমাবেশ। উপক্রম—সূত্রপাত, আরম্ভ। উত্তেজনা—উদ্দীপনা, তীব্র প্রবল মানসিক আবেগ। উৎসাহ—আগ্রহ, উদ্যম, অধ্যবসায়। আক্রমণ—অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ, অধিকার বা জয় করবার জন্য হানা। প্রতিজ্ঞা—সংকল্প, দৃঢ় পণ/অঙ্গীকার, শপথ।

৪. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

রেষারেষি, ক্ষীণ, বিষণ্ণ, বিষম, উৎসাহ।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

আশ্চর্য, দুশ্চিন্তা, উপস্থিত।

৬. ‘ফিস ফিস করে বললে’ অর্থ অত্যন্ত আস্তে/নিচু গলায় বলা বোঝায়। ‘কথা বলা’র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, এমন কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ লেখো।

৭. ‘খেলোয়াড়গণ’— ‘খেলোয়াড়’ শব্দের সঙ্গে ‘গণ’ জুড়ে তাকে বহুবচনের রূপ দেওয়া হয়েছে। একবচন থেকে বহুবচনের রূপ পাওয়ার পাঁচটি কৌশল নতুন শব্দ গঠন করে দেখাও।

৮. গল্প অনুসরণে নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

৮.১ ‘আজকের খেলাটা যে খুব জমবে তাতে সন্দেহ নেই।’ — কোন বিশেষ দিনের কথা এখানে বলা হয়েছে? সেদিনের সেই ‘খেলা’র মাঠের দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৮.২ ‘সমরেশদা কোথায় গেছে?’ — এই সমরেশদার পরিচয় দাও। সে কোথায়, কোন উদ্দেশ্যে গিয়েছিল? তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কি?

৮.৩ ‘এই সময় মাঠে রেফারির বাঁশি বেজে উঠল’— ‘রেফারি’ টি কে? তাঁর সম্পর্কে ছেলেদের ধারণা কীরূপ ছিল? খেলার মাঠে তিনি কেমন ভূমিকা পালন করলেন?

৮.৪ খেলায় যে ফলাফল হলো, তাতে তুমি কি খুশি হলে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৮.৫ গল্পে যে ফলাফলের কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীতটি যদি ঘটত, তা হলে গল্পের উপসংহারটি কেমন হতো তা নিজের ভাষায় লেখো।

৮.৬ গল্পে বলা হয়েছে— ‘আজ টুনুই আমাদের হিরো।’— তোমার টুনু চরিত্রটিকে কেমন লাগল? সত্যিই কি নায়কের সম্মান তার প্রাপ্য?

৮.৭ গিরীন কীভাবে খেলার মাঠে টুনুকে ক্রমাগত উৎসাহ আর সাহস জুগিয়েছিল তা আলোচনা করো।

৮.৮ ‘অন্ধসংস্কারের প্রতি আনুগত্যের জোরে নয়, প্রবল প্রচেষ্টা আর মানসিক জোরেই জীবনে সাফল্য আসে’— ‘গাধার কান’ গল্পটি অনুসরণে উদ্ধৃতিটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৯. তোমার দেখা/খেলা কোনো ফুটবল ম্যাচের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ - ১৯৭০) : বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্ম। ‘গৌড় মল্লার’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ডিটেকটিভ কাহিনি গুলি শরদিন্দু-র স্মরণীয় সৃষ্টি। বড়োদের গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি শিশু কিশোরদের জন্য তাঁর লেখালেখির পরিমাণও কম নয়। শিশু সাহিত্যে তাঁর একটি স্মরণীয় নায়ক চরিত্র ‘সদাশিব’। পরিণত বয়সে অনেকটা সময় মুম্বাই ও পুণেতে কাটানোয় শিবাজি-র প্রথম জীবনের নানা ধরনের বিচিত্র রসের কাহিনি ধরা দিয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে।

ভাটিয়ালি গান

জসীমউদ্দীন

ও আমার দরদী আগে জানলে
আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।
ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না আর
দূরের পাড়ি ধরতাম না।
আমি নবলাখ বাণিজ্যের বেসাত
এই নায় বোঝাই করতাম না।
ছিলো সোনার দাড় পবনের বৈঠা
ময়ূরপংখী নাও খানা
চন্দ্র সুরজ গলুই ভরি
ফুল ছড়াতে জোছনা।
শওঁ শওঁ শওঁ শওঁ দরিয়াতে উঠে ঢেউ
এই তুফানেতে কেউ গাঙ পাড়ি দিও না
ওরে বিষম দইরার পানি দেইখ্যা
ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।

লবঙ্গ লতিকার দেশে
যাবার ছিলো বাসনা
ওরে মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবিলো
উপায় কী তার বলো না।
কলকল ছলছল আগে চল আগে চল
নাই বল তবু বল
ওরে মাঝি তুই কেন
হলি আজ বিমনা
ও তোর সামনে নাচে বিজ্‌লি লয়ে
কন্যা সোনার বরণা।

ভাটিয়ালি পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতির প্রকার বিশেষ। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশুদ্ধ ভাটিয়ালিতে তাল থাকে না। এ গান ছন্দ প্রধানও নয়। সাধারণত খোলা মাঠে রাখালের মুখে বা নদীর বুকে মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। বিষয় এবং অবস্থাভেদে ভাটিয়ালিতে অনেক শ্রেণি আছে। একদিক দিয়ে ভাটিয়ালিকে পূর্ববঙ্গের বহুবিধ লোকগীতির ভিত্তিস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। রূপকথার গানে ও কিছু মেয়েলি গানের গীতিরীতিতে ভাটিয়ালির আভাস আছে। এই গান দুই-বাংলারই নিজস্ব সম্পদ। এইসব গানে বাংলার নদীমাতৃক প্রকৃতির সঙ্গে দেহতত্ত্ব, গুরুসাধনার কথাও মিশে আছে। মুখে মুখে এই গানগুলি প্রচলিত হলেও, কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় যাঁরা ভাটিয়ালি গান রচনা করেছেন ও সুর দিয়েছেন। যেমন সিরাজ আলি, রশিদউদ্দিন, জালাল খান, জং বাহাদুর, শাহ আবদুল করিম, উমিদ আলি প্রমুখ। গায়ক আব্বাসউদ্দিন এই ধারার গানের বিখ্যাত নাম।

জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬) : বিখ্যাত কবি, গীতিকার, লোকসংস্কৃতি গবেষক। তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে ‘পল্লীকবি’ হিসেবেই অধিক পরিচিত। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে বিখ্যাত এই ভাটিয়ালি গানটি জসীমউদ্দীনের ‘রঙ্গিলা নায়ের মাঝি’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

পটলবাবু ফিল্মস্টার

সত্যজিৎ রায়

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরের থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন

'পটল আছ নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানি বাড়ির পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? সক্কাল-সক্কাল?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে?'

'এই ঘণ্টাখানেক। কেন?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো? আজ তো ট্যাগোর্‌স বার্থডে। আমার ছোটোশালার সঙ্গে কাল নেতাজি ফার্মেসিতে দেখা হলো। সে ফিল্মে কাজ করে—লোকজন জোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সিনের জন্য একজন লোক দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিশ দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেন্টও দেবে অবশ্যি...'

সক্কালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেননি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বৈকি। এ যে একেবারে

অভাবনীয় ব্যাপার!

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এককালে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে 'না', বলার আর কী আছে? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি! কী নাম বললেন আপনার শালার?'

'নরেশ। নরেশ দত্ত। বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা। দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নির ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলংকা কিনে ফেললেন। আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন। এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এককালে পটলবাবুর রীতিমতো অভিনয়ের শখ ছিল। শুধু শখ কেন— নেশাই বলা চলে। যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে, পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা। হ্যান্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর। একবার তো নীচের দিকে আলাদা করে বড়ো অক্ষরে নাম বেরুল—পরাশরের ভূমিকায় শ্রী শীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু)। তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর। উনিশশ চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যান্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভটচাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। কটা বছর কেটেছিল ভালোই। আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে। তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হলো ছাঁটাই, আর পটলবাবুর নবছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর। গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায়। তারপর একটা বাঙালি আপিসে কেরানিগিরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়োকর্তা বাঙালি সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি। তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন পটলবাবু! কিন্তু যে-অভাব, যে-টানাটানি, সে আর দূর হয়নি কিছুতেই। সম্প্রতি তিনি একখানি লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

আর অভিনয়? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কী। নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভালো, তাই কিছু ভালো ভালো পার্টের ভালো ভালো অংশ এখনও মনে আছে!—'শুন পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল মহারণে। জিনি শত পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—বৃকোদর সঞ্চালনে!'...ও! ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন!' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতলভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন!'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ... মানে চলবে তো?

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল? রবিবার?'

'হ্যাঁ...কোনো স্টুডিয়োতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ের ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো? সাততলা বিল্ডিং একটা? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না?'

'পার্ট হলো গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কী! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজি পেডেস্ট্রিয়ান।... ভালো কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রং তো?'

'বাদামি গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না! আর আমাদের সিনটাও শীতকালের, ভালোই হবে... কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস!'

পটলবাবুর ধাঁ করে জরুরি প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

'পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো? কথা বলতে হবে তো?'

'আলবত! স্পিকিং পার্ট!...আপনি আগে অভিনয় করেছেন তো?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...'

'তবে! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন? সে তো রাস্তা থেকেই যে কোনো একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হলো!...ডায়লগ আছে বৈকি এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। 'আসি...'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি—বুঝলে গিন্নি—এ পার্টটা হয়তো তেমন একটা বড়ো কিছু নয়; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড়ো কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো? মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা; আর তাঁর থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো? ওয়াটস সাহেবের হ্যান্ডশেক মনে আছে? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মেডেল? অ্যাঁ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ! কী বলো অ্যাঁ? মান, যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে, হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি!...

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নি বললেন, 'করো কী?'

'কিচ্ছু ভেব না গিন্নি। শিশির ভাদুড়ি সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি!'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনোদিন কিচ্ছু হয় না?'

'হবে হবে! সব হবে! ভালো কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক...'

পরদিন সকালে মেট্রোপলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও মিশন রো-এর ফ্যারাডে হাউসে পৌঁছতে লাগল আরও মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়ো—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডাণ্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মতো দেখতে জিনিস। এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালিও লক্ষ করলেন পটলবাবু; কিন্তু এদের যে কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায়? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই চেনেন না!

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলার চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে!'

অতুলবাবু? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দায় একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রী শীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামে জানত।'

'ও! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন বছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করেছি; লেট হইনি একদিনও। নট এ সিঙ্গেল ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'নরেশ!'

'স্যার?'

'উনি কি আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনি... মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো; শট নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়োস্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোনো মিলই তো নেই! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার।

কিন্তু তাঁর ডায়লগ কই? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনও তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি? ওই তো নরেশবাবু! একবার তাঁকে বলা উচিত নয় কি? পার্ট ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, ভালো করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সেই পার্ট! না হলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয়। আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয়নি যে!

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চিৎকার শুনে থমকে গেলেন।

'সাইলেন্স!'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট নেওয়া হবে! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না!'

তারপর আবার সেই প্রথম গলার চিৎকার এল—'সাইলেন্স! টেকিং!' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন; গলার একটা চেন থেকে দূরবিনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয়নি!

এবারে পর পর আরও কতগুলো চিৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউন্ড!' 'রানিং।' 'অ্যাকশন!'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপি-রং-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হনহনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চিৎকার শুনলেন 'কাট', আর অমনই সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন,'ছোকরাটিকে চিনলেন তো?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চারখানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার। কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি। ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচড়াপাড়ার মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে; বেড়ে ফিমেল পার্ট করত চিনু!

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির

নাম কী মশাই?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না। উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে।'

যাক। কতগুলো দরকারি জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নি যদি জিজ্ঞেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তা হলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে!'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমার ডায়ালগটা যদি এইবেলা দিতেন তো—'

'ডায়ালগ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক!'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো! সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু...এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো। দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটি লাল কলম বার করে শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ'।

আঃ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন? কঠিন মনে হচ্ছে?'

এরা কি তা হলে ঠাট্টা করছে? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদী মানুষকে ডেকে এনে এতবড়ো শহরের এতবড়ো রাস্তার মাঝখানে ফেলে রংতামাশা? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'শুধু ''আঃ''? আর কোনো কথা নেই?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু? ও কি কম হলো নাকি? এ তো রেগুলার স্পিকিং পার্ট! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পিকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই! জানেন, আমাদের এই ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শো লোক পার্ট করে গেছে যারা কোনো কথাই বলেনি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেওনি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত

দেখা যায়নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন ল্যাম্প পোস্টের পাশে; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সিনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকী আমাদের যে নায়ক চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোনো ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু— ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড়ো চাকুরে। সিনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি— একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপনার দিকে দৃকপাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরোচ্ছে—বুঝেছেন? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে দেখুন!'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধা হবে। আরেকটা শট আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড়দৃষ্টিতে দেখে, আশেপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কি না দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ!'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল।

শুধু একটিমাত্র কথা কথাও না, শব্দ— আঃ!

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মণখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-নটা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামাসংগীত হয় রবিবার সকালে; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই যাবেন নাকি চলে? গেলে ক্ষতিটা কী? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেইসঙ্গে।

'সাইলেন্স'!

দুর! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। এর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার...থিয়েটার...

অনেককাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা—'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোটো পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনো অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হলো পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশি মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশি। পটলবাবুর নাট্যগুরু ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশি, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরও একটা কথা বলতেন পাকড়াশি মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হলো এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়তো তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হলো তোমার—অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশির কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই? একমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে— 'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এককথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ—পটলবাবু বারবার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠান্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরও আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া আরও কতরকম আঃ রয়েছে— দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোটো করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ'-টাকে খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হলো তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি? এই একটা কথা সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে!

'সাইলেন্স!'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া'?

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরও আধ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন'।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অপেক্ষা করব বইকী! আমি এই কাছাকাছিই আছি।'

'দেখবেন, আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালোই হলো। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে-কজন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেইসঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কীরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কীরকম ভাবে

চিতিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কীরকম হতে পারে— এই সবই একটা কাচের জানলায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল; এখন আর তাঁর মনে কোনো নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ; পঁচিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড়ো দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'বেশ। আমি প্রথম বলব 'স্টার্ট সাউন্ড'। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলবে 'রানিং'। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব 'অ্যাকশন'! বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এইদিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এইরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন?'

পটলবাবু বললেন 'একটা রিহার্সাল...?'

'না না,' বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শটটা।'

'কেবল একটা কথা...'

'আবার কী?'

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই... মানে অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো... ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো... হ্যাঁ। এইবার এই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান।
চঞ্চল তুমি রেডি?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার'।

'গুড। সাইলেন্স!'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্ট, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কীরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টিনের বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধাক্কিতে খুলে যাবে না তো?'

ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন? আপনি দারা সিং-এর সঙ্গে কুস্তি করুন না— তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে আয়না ছিল, পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো! বেশ মানিয়েছে! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স! সাইলেন্স!'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে

সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ করলেন সমবেত জনতার বেশিরভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর পটলবাবু ধাক্কার জায়গায় পৌঁছোবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দুজনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তা হলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছআনা বিস্ময় মিশিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন!'

জয় গুরু!

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার সঙ্গে তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে কাগজটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হলো কি?' পটলবাবু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভালো অভিনেতা মশাই!... সুরেন, কালো কাচটা একবার চোখে লাগিয়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগেনি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি। গগন পাকড়াশি আজ তাকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে আর পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে! সাইলেন্স! সাইলেন্স!... ওহে নরেশ, চলে এসো, ভিড় সামলাও!'

১. বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো :

১.১ পটলবাবু অভিনয়ের সময়ে সংলাপ হিসেবে বলেছিলেন (ওঃ/উঃ/আঃ) শব্দটি।

১.২ অভিনয়ের সময় পটলবাবুর হাতে ছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা/যুগান্তর/স্টেটসম্যান)।

১.৩ অভিনয়ের সময় পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল (ঝুঁপো/চাড়া-দেওয়া/বাটারফ্লাই) গোঁফ।

১.৪ (বরেন দত্ত/বরেন মল্লিক/বরেন চৌধুরী)-র পরিচালিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন পটলবাবু।

১.৫ করালীবাবুর বাড়িতে (কীর্তন/শ্যামাসংগীত/কথকতা) হয় (শনিবার বিকেলে/রবিবার সকালে/রবিবার বিকেলে)।

২. নীচের এলোমেলো ঘটনাগুলি গল্পের ঘটনাক্রম অনুযায়ী লেখো :

২.১ টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?

২.২ তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।

২.৩ পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে?'

২.৪ দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

২.৫ সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা?

২.৬ ঠিক আধঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল, এখন আর তাঁর মনে কোনো নিরুৎসাহের ভাব নেই।

৩. গল্প থেকে এই যে অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে, শুটিং-এর সেই ব্যস্ত পরিস্থিতিটি তোমার নিজের ভাষায় নতুন করে লেখো:

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই... মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে...'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো... ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো... হ্যাঁ। এইবার এই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি?

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, ‘ইয়েস স্যার।’

‘গুড। সাইলেন্স।’

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, ‘ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্ট, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টরটা পুরোপুরি আসছে না।’

‘কীরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।’

‘বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।’

৪. **নীচের শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দ পাঠ্য অংশটিতে পাবে। খুঁজে নিয়ে লেখো :**

উৎসাহহীন, নিরালা, অপ্রত্যাশিত, নিরুপদ্রব, লাঞ্ছিত, সন্ধান, প্রশংসা, পথিক।

৫. **নীচের শব্দগুলিতে যে ইংরেজি শব্দগুলি আছে, তার বদলে বাংলা শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার নতুন করে লেখো :**

৫.১ বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট?
৫.২ এই, দাদুকে ডায়ালগ লিখে দে।
৫.৩ একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজি পেডেস্ট্রিয়ান...
৫.৪ তাহলে একটু ওদিকে সরে গিয়ে ওয়েট করুন।
৫.৫ আজ তো ট্যাগোরস বার্থ ডে।
৫.৬ সাইলেন্স! রোদ বেরিয়েছে।
৫.৭ থিয়েটার এর চেয়ে শতগুণে ভালো...
৫.৮ আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।

৬. **নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

দোহারা, ব্যস্তসমস্ত, আমুদে, অন্যমনস্ক, দরকারি, গম্ভীর, নির্জন, আচ্ছন্ন।

৭. **নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

প্রস্তাব, অভিনয়, ফরমাশ, ঔদ্ধত্য, পরিশ্রম, সাফল্য, উৎকণ্ঠা, আত্মতৃপ্তি।

শব্দার্থ : হদিস— সন্ধান, খোঁজখবর। নগণ্য— সামান্য, তুচ্ছ, গণনার অযোগ্য। অভাবনীয়— অপ্রত্যাশিত। ফরমাস— আদেশ, নির্দেশ। স্মরণশক্তি— মনে রাখার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি। বৃকোদর— ভীম। আগন্তুক— অতিথি, অপরিচিত অভ্যাগত। পথচারী— পথিক। প্রতিপত্তি— সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব। ঠাহর— মনোযোগ দিয়ে দেখা। অপদস্থ— লাঞ্ছিত, অসম্মানিত। পরিহাস— ঠাট্টা, কৌতুক। নিরীহ— নিরুপদ্রব, শান্তশিষ্ট। নির্বিবাদী— নির্বিরোধ। নিষ্ঠুর— নির্মম, দয়াহীন। দৃকপাত— ভ্রূক্ষেপ, ফিরে তাকানো। ঋষিতুল্য— ঋষির মতো জ্ঞানী ও শ্রদ্ধার্হ। নিরুৎসাহ— হতাশ, উৎসাহহীন। বাজিমাত— বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব, খেলার জয়যুক্ত সমাপ্তি। নিরিবিলি— নিরালা, নিভৃত। বাসিন্দা— বাসকারী, অধিবাসী। তামাশা— ঠাট্টা, কৌতুক, পরিহাস। রোমাঞ্চ— পুলক। আন্দাজ— অনুমান। তারিফ— প্রশংসা। আত্মতৃপ্তি— নিজের সন্তোষ। আচ্ছন্ন— অভিভূত। কদর— মর্যাদা, যোগ্যতা।

৮. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ, অনির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ আর পূরণবাচক শব্দগুলি খুঁজে বার করে লেখো :

৮.১ নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্‌চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ি পরেই থাকেন।

৮.২ বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা।

৮.৩ বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা.... অনুমান করা কঠিন বৈকি!

৮.৪ পটলবাবুর ন'বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

৮.৫ তারপর এই দশটা বছর .... কী-না করেছেন পটলবাবু।

৮.৬ সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন।

৮.৭ ...পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে.... চলতে আরম্ভ করলেন।

৯. নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে বদলে লেখো :

উৎকণ্ঠা, প্রয়োগ, উচ্চারণ, বিরক্তি, দম্ভ, ঔদ্ধত্য, অনুভব, পরিবেশন

১০. নীচের শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :

টক করে, ধা করে, তিড়িং করে, হন্তদন্ত হয়ে, ঠাহর করে, ঝিমঝিম করে, ফিসফিস করে, টুক করে।

১১. নীচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :

গভীর, বিকৃত, নির্জন, সার্থক, সংযত, নির্বিবাদী, তীব্র, উচিত

১২. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :

১২.১ নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি এই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু।

১২.২ এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন।

১২.৩ নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

১২.৪ শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

১৩. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৩.১ পটলবাবুর কাছে যেদিন ফিল্মে অভিনয়ের প্রস্তাব আসে, সেদিন ছুটির দিন ছিল কেন?

১৩.২ বাজারে গিয়ে কেন গৃহিণীর ফরমাশ গুলিয়ে গেল পটলবাবুর?

১৩.৩ থিয়েটারে পটলবাবুর প্রথম পার্ট কী ছিল ?

১৩.৪ উনিশশো চৌত্রিশ সালে পটলবাবু কলকাতায় বসবাস করতে এলেন কেন?

১৩.৫ পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়া আর হলো না কেন পটলবাবুর?

১৩.৬ পটলবাবু তাঁর সময়নিষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য কোন উদাহরণ দিতে ভালোবাসতেন?

১৩.৭ 'পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল'— পটলবাবু এমন লজ্জা পেলেন কেন?

১৩.৮ 'গগন পাকড়াশি আজ তাঁকে দেখলে সত্যিই খুশি হতেন'— তিনি খুশি হতেন কেন?

১৪. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৪.১ ‘আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল’— কার মনে পড়ে গেল পটলবাবুর কথা? পটলবাবুর কথাই বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ল কেন?

১৪.২ ‘গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনোদিন কিচ্ছু হয় না?’ পটলবাবুর গৃহিণীর এই মন্তব্যের কারণ কী?

১৪.৩ কার উপদেশের স্মৃতি পটলবাবুর অভিনেতা-সত্তাকে জাগিয়ে তুলল? কোন ‘অমূল্য’ উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন পটলবাবুকে?

১৪.৪ ‘ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়— ওঃ!’ বক্তা কে? কোন ঘটনার ফলে তাঁর এমন মন্তব্য?

১৪.৫ ‘এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায়নি’— এই অনুভব কীভাবে জাগল পটলবাবুর মনে?

১৪.৬ পটলবাবুর ফিল্মে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রোডাকশন ম্যানেজার নরেশ দত্তের অনেকগুলি ব্যস্ত মুহূর্ত। টুকরো মুহূর্তগুলি জোড়া দিয়ে নরেশ দত্ত নামে মানুষটির সম্পূর্ণ ছবি নিজের ভাষায় তৈরি করো।

১৫. দশটি বাক্যের মধ্যে উত্তর দাও :

১৫.১ ‘আঃ’— এই একটিমাত্র শব্দের উচ্চারণ কৌশলে আর অভিনয়দক্ষতায় ‘একটা আস্ত অভিধান’ লিখে ফেলা যায়, শব্দটি নিয়ে ভাবতে এমনটাই মনে হয়েছিল অভিনেতা পটলবাবুর। পটলবাবুর ভাবনাধারা কি ঠিক বলে মনে হয় তোমার? ‘আঃ-শব্দের উচ্চারণে কত ধরনের ভাবপ্রকাশ সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?

১৫.২ ‘সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা! আচ্ছা ভোলা মন তো!’ তোমার কী মনে হয়, সফলভাবে কাজ করার পরেও কেন টাকা না নিয়েই চলে গিয়েছিলেন পটলবাবু? পটলবাবুর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি কি যথার্থ বলে মনে হয় তোমার? নিজের যুক্তি দিয়ে লেখো।

১৫.৩ কেমন করে শুটিং চলে, তার জীবন্ত কিছু টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে এই গল্পের আনাচে কানাচে। সেই সব টুকরো জুড়ে জুড়ে নিজের ভাষায় শুটিং-এর মুহূর্তগুলির একটি সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করো।

১৫.৪ অভিনয়ের নানা ধরনের প্রসঙ্গ এই গল্পে ছড়িয়ে আছে। থিয়েটার আর সিনেমার অভিনয়ের ধরনে সাদৃশ্য আর বৈসাদৃশ্যের কিছু কথা মনে এসেছিল পটলবাবুর। পটলবাবুর মতামত নিজের ভাষায় লিখে, এবিষয়ে তোমার কোনো মতামত থাকলে তাও জানাও।

১৫.৫ বছর পঞ্চাশের বেঁটেখাটো টাকমাথা নাট্যপ্রিয় পটলবাবুকে তোমার কেমন লাগল নিজের ভাষায় লেখো।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১— ১৯৯২) : বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। বিশ্ববন্দিত এই চলচ্চিত্রকার একই সঙ্গে সংগীতস্রষ্টা, প্রচ্ছদশিল্পী, সাহিত্য রচয়িতা। দীর্ঘকাল ‘সন্দেশ’ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—‘ সোনার কেল্লা’, ‘বাদশাহী আংটি’, ‘এক ডজন গপ্পো’, ‘আরো বারো’। ১৯৬৭ সালে তাঁর ‘প্রফেসার শঙ্কু’ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থরূপে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৯২ সালে তিনি ‘ভারতরত্ন’ পান।
পটলবাবু ফিল্মস্টার গল্পটি তাঁর ‘এক ডজন গপ্পো’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

চিন্তাশীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'—দু - হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'— এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা! কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় নিমগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ।

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়। ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।
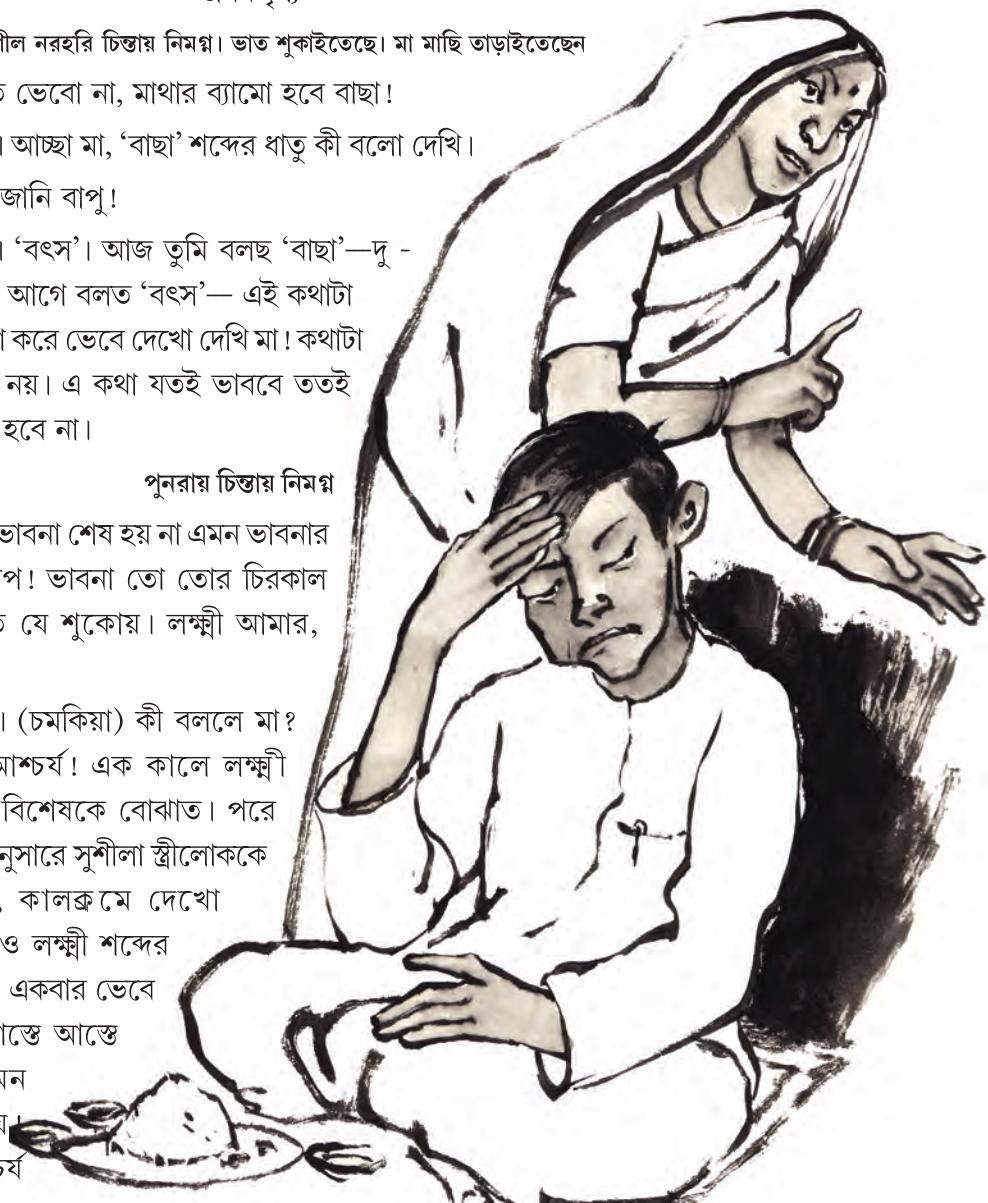
ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল দেখি উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে, ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান]

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি— সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয় না! অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না! আহা, কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বলো কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র!

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু !

[প্রস্থান]

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়!

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্টে যায়। রোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। **(চারি দিকে চাহিয়া)** একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে— মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উলটো কথা বললে! মাছি তো ভন ভন করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশে

নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি-মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ-অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না—দণ্ড বৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ড বৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা, এসো আদর করি। **(শিশুকে কোলে লইয়া)** কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো, একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বল কী! ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জানো? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধরে আমাদের সমস্ত যৌবন কালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায় — তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি মা!

মা। থাক বাবা, সে কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগ্নেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এইরকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

(কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি। তা যাও-না মা! তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হলো না। (প্রকাশ্যে) তা হলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি? তা হলে আমাকে আর কিছুদিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না— আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

১. **একই অর্থযুক্ত শব্দ নাটক থেকে খুঁজে বের করে লেখো :**

মক্ষিকা, হাজির, অস্থির, ব্যবস্থা, ঢাকা বা আবৃত।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ
আদর	———
———	ভেতো
শোক	———
———	প্রামাণ্য
নির্ভর	———
———	আমুদে

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ 'কথাটা বড়ো সামান্য নয়'— বক্তা কে? কার কোন কথাটা সামান্য নয়?

৩.২ 'এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো?'—কে কাকে এই কথা বলেছে? কোন ভাবনাকে বাজে বলা হয়েছে? তা কি সত্যিই 'বাজে ভাবনা' তোমার কি মনে হয়?

৩.৩ 'আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়।'— বক্তা কে? তার কোন কথায় নরহরি শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে?

৩.৪ 'রোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি'— নরহরি কার কাছে কী প্রমাণ করে দিতে চেয়েছিল?

৩.৫ 'আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?'— এর প্রত্যুত্তরে নরু মাকে কী কী বলেছিল?

৩.৬ 'তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।'— কে কাকে বাধা দিতে চায়নি?

৩.৭ 'এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না'— কার স্বগতোক্তি? কাকে বেশি ভাবতে হলো না? কেন?

৪. 'চিন্তাশীল নরহরি সবার সব কথাতেই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে, অথচ মায়ের কাশীবাসী হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে শুনে তখনই সে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু তার মা যেই টাকার বন্দোবস্ত করতে বলেন, সে আবার ভাবতে বসে'— এ থেকে নরহরি চরিত্রটি সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা হলো?

৫. **ঠিক বানানটি বেছে নিয়ে লেখো :**

ব্যমো/ব্যামো	পরিবর্তণ/পরিবর্তন	ব্যাস্ত/ব্যস্ত
লক্ষ্মী/লক্ষী	প্রমান/প্রমাণ	মুখস্থ/মুখস্ত

৬. **নীচের বাক্যগুলিকে বদলে চলিত রীতিতে লেখো:**

৬.১ ভাত শুকাইতেছে, মা মাছি তাড়াইতেছেন।

৬.২ নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ।

৬.৩ নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন।

শব্দার্থ : ব্যামো — অসুখ। নিমগ্ন— ডুব দেওয়া বা নিমজ্জিত। ধাতু— ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি বা শব্দমূল (এখানে)। কুরুক্ষেত্র— কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। লোমাঞ্চিত— শিহরিত/ রোমাঞ্চিত। অন্তঃকরণ—হৃদয় বা মন। বন্ধ— বাঁধা। দণ্ডবৎ— প্রণাম। আমোদ— আহ্লাদ/আনন্দ। নিতান্ত—খুব। বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা। রোসো— অপেক্ষা করো। চিন্তাশীল— ভাবুক।

৭. **অর্থ লেখো :**

বৎস, রোসো, দণ্ডবৎ, ভাগিনেয়, বন্দোবস্ত।

৮. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

পৃথিবী, সূর্য, স্ত্রীলোক, মা

৯. নাটক থেকে পাঁচটি নির্দেশক ও অনির্দেশক শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১০. 'বাছা' শব্দটি কোন ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ?

'বাছা' শব্দের দুটি প্রতিশব্দ লেখো।

১১. 'দাড়ি' শব্দের সাধু রূপটি লেখো।

১২. 'হেসেই কুরুক্ষেত্র'— শব্দবন্ধের মূল ভাবটি কী?

১৩. 'গুরু' শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

১৪. 'সূর্য তো অস্ত যায় না' এখানে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস দেওয়া হয়েছে?

১৫. 'মাথা' শব্দটি কোন তৎসম শব্দ থেকে এসেছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'কথা ও কাহিনী', 'সহজপাঠ', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', ' হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। 'চিন্তাশীল' নাটিকাটি তাঁর 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৬. ‘ভাত জুড়িয়ে গেল’— এখানে কথাটির অর্থ ভাত ঠান্ডা হয়ে গেল/ শুকিয়ে গেল। ‘জুড়িয়ে গেল’ শব্দবন্ধকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করে একটি বাক্য লেখো।

১৭. ‘মাছি ভন ভন করছে’— ‘ভন ভন’—এর মতো আরো পাঁচটি ধ্বন্যাত্মক/অনুকার শব্দদ্বৈত তৈরি করো।

১৮. ‘কাশী’ কোন রাজ্যে অবস্থিত? ‘কাশী’র প্রসিদ্ধির কারণ কী?

১৯. নাটকটিতে মোট কটি ‘দৃশ্য’ রয়েছে? কোন কোন দৃশ্যে কাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়?

২০. গুরুতর— এরকম শব্দের পরে ‘তর’ যোগ করে পাঁচটি নতুন শব্দ লেখো।

২১. সন্ধিবিচ্ছেদ করো— আশ্চর্য, উপস্থিত, পুনশ্চ।

২২. উচ্চারণে বিকৃত শব্দগুলির পাশাপাশি মূল শব্দগুলি লেখো :

জিজ্ঞেস, ব্যামো, কও, হপ্তা, দিকি, সম্মুখে।

২৩. নরহরি ভাগ্নের ডাকনামটি কী তা পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

২৪. শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :

বাঁচা	পুরুষ	সকল	পারা	ভাষা
বাছা	পরুষ	শকল	পাড়া	ভাসা

২৫. ‘মাথা’ শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।

২৬. নাটকটির নামকরণ তোমার যথাযথ মনে হয়েছে কি-না তা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

২৭.

মূল শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত অর্থ
লক্ষ্মী		
অন্ন		
বৎস		

দেবতাত্মা হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভোরে এল আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল । কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলছে রেনক্ রোড তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দুর্যোগ বেশি, এবং দুঃসাধ্যও বটে। সুতরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসংকটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসংকট হলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক কমাইল আমার জানা নেই। এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙালি গিয়েছিলেন তিব্বতে।

তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বাংলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপুরের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়শো বছরের বেশি আগে ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানঋষি দীপঙ্কর তিব্বত গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নির্মল স্বরূপকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন এবং লাসার নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজা করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে , তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ড যখন তিব্বত জয় করতে যান, তখন শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন— এটি স্যার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপঙ্করের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালিও তিব্বতে গিয়ে আচার্য বোধিসত্ত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপুত্র শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপঙ্করের যে বিপুল কীর্তির কথা আমরা জানি, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মিরের পূর্ব প্রান্তে ভারত তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হলো গারটক, কিন্তু সে বহুদূর এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়ুনের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপু লেক গিরিসংকট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোট হলো তিব্বতিদের ঘাঁটি। নেপালেও আছে নামচেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা—সেই গতিতে গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চলে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতি আর মারোয়াড়ি তার আশেপাশে। এইটি হলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসা। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশ্য নির্দশন হলো বড়ো বড়ো অট্টালিকা,আর অগণ্য কুঠিবাড়ি।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। বড়ো গির্জাটা হলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে চড়াই-পথ এদিক ওদিক ঘুরে অনেক উঁচুতে গ্রেহামস হোমের দিকে। এখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং সাহেব সুবার অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে মানুষ হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট কীর্তি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে আবার ফিরে এলুম ডা. দাশগুপ্তের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সংকীর্ণ গলির নীচে নেমে যে মন্দিরটির চত্বরে এসে দাঁড়ালুম, এটির কথা আজও ভুলিনি। দেখে নিলুম সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রিবাস করে গিয়েছিলুম আমি আর শশাঙ্ক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিলুম বটে, কিন্তু কালিম্পঙ চোখে পড়েনি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই ২৫ বৈশাখের অপরাহ্ণ। কবি রয়েছেন গৌরিপুর প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটর্নী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা । অমল হোমের কলম এবং রজনীগন্ধার গুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহাকবি জানতেন,আমি তখন 'যুগান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেখা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানা রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিগ্বলয় ছাড়িয়ে

কবির মাথা উঠেছে ধবলাধার গৌরীশৃঙ্গের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়ো,— পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড়ো এপিক পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাবুকে আনিয়েছি, ওঁর সাহায্য নেবো।—

তাঁকে যখন জানালুম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সুহাস কবির মুখখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাচ্ছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সুন্দর শ্বেতশ্মশ্রুময় মুখে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশয়ান। দু-চারটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছুটতে লাগলো। সেই বাণে আমিই বিদ্ধ হচ্ছি বারম্বার এবং হাসির রোল উঠছে এপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেইদিনকার সেই ২৫ বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে পাঠ করবেন, সেজন্য কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা— কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটনো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকেই। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। কয়েকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষে। তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত নৃপেন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝেমাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্য পাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে সূক্ষ্ম যন্ত্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশঙ্কাটা ছিল রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মনে। সেজন্য উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে নৃপেনবাবু একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যন্ত্রে মুখ রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কেঁপে উঠলুম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হলো। নধর মখমল বসানো চেয়ারে বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো, ক্যালকাটা...হ্যালো...?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—‘ও-কে’। (o.k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র— কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে— সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ করে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কণ্ঠের মূর্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়—

“আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে

ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হ’তে

মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।”

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো কিনা সেকথা তখন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরে। একটা মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম পরস্পরের অস্তিত্ব। (নির্বাচিত অংশ)

শব্দার্থ : প্রাতরাশ—সকালের আহার, জলখাবার। দুর্যোগ—ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ভরা সময়। গিরিসংকট—পর্বতশ্রেণির মধ্যে সংকীর্ণ নিম্ন ভূমি, যা পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুলগুরু—বংশপরম্পরায় সকলেই যে গুরুর শিষ্য। আনুপূর্বিক— প্রথম থেকে শেষ, ক্রম অনুযায়ী। ভারতবরেণ্য—ভারতের বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ মানুষ। রাজপুত্র— রাজকুমার। রাজকীয়— রাজ-সম্বন্ধীয়, সরকারি। সম্বর্ধনা—সম্মান জানানোর অনুষ্ঠান। অগম্য— দুর্গম, সহজে যাওয়া যায় না যেখানে। কুঠিবাড়ি— রাজপুরুষ বা পদস্থ কর্মচারীর কার্যালয় ও বাসস্থান। অভিজাত—সমৃদ্ধ, কুলীন, শ্রেষ্ঠকুলজাত। সংকীর্ণ— অপ্রশস্ত, সরু। চত্বর—চাতাল। ঝুপসি— বায়ুপ্রবাহহীন আলোকশূন্য ঝোপঝাড়ের পরিবেশে অবস্থিত। ব্যক্তিত্ব— ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য/স্বাতন্ত্র্য। বৈদান্তিক— বেদান্তদর্শনে অভিজ্ঞ। রেখাচিত্র— কেবল রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। দিগ্বলয়— দিগন্তরেখা। দুরূহ— কঠিন, কষ্টসাধ্য। সৌম্য— প্রিয়দর্শন, প্রশান্ত। সুহাস— শোভন হাস্যযুক্ত। রক্তিমাভা— লাল আভা। শ্বেতশ্মশ্রুময়—সাদা দাড়ি ভরা। অর্ধশয়ান— আধশোওয়া। বাক্যবাণ— কথার আঘাত যা বিদ্ধ করে, নিষ্ঠুর কথা। নবরচিত— নতুন রচনা করা হয়েছে এমন। বেতারযোগে— রেডিয়োর মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষ— যাদের ওপর পরিচালনার ভার। বন্দোবস্ত— ব্যবস্থা। অর্থব্যয়—অনেক টাকা খরচ। বিশেষজ্ঞ— কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে যার। স্বনামখ্যাত— যে নিজের নামেই পরিচিত বা বিখ্যাত। বিদীর্ণ— ভগ্ন, খণ্ডিত। ফরমাশ— আদেশ, নির্দেশ। নধর— সরস কোমল লাবণ্যময়। তৎক্ষণাৎ— তখনই। রোমাঞ্চ— পুলক, হর্ষ। পুলক— হর্ষ, আনন্দ। মূর্ছনা—সুরের আরোহণ ও অবরোহণ। উচ্ছ্বসিত— স্ফুরিত, স্পন্দিত, উৎফুল্ল। বিলুপ্ত—সম্পূর্ণ লোপ। ছাড়পত্র— রসিদ, দাবি-ত্যাগের প্রমাণপত্র। মায়াচ্ছন্ন— মায়ায় ঢাকা। স্বপ্নলোক— স্বপ্নের রাজ্য। অস্তিত্ব— সত্তা, বিদ্যমানতা।

১. বন্ধনীতে দেওয়া একাধিক উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলি আবার লেখো :

১.১ লামারা রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন রাজপুত্র (তিষ্য রক্ষিত/শান্ত রক্ষিত/ কুমার রক্ষিত)-কে।

১.২ তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসা (পশম/ রেশম/ তাঁতবস্ত্র)-এর।

১.৩ কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক (বড়ো মন্দির/ বড়ো মসজিদ/বড়ো গির্জা)।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখক তুলে দিয়েছিলেন (অমৃতবাজার পত্রিকা/ যুগান্তর/ আনন্দবাজার পত্রিকা)-র 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'।

১.৫ নবরচিত একটি কবিতা রেডিওতে আবৃত্তি করতে রবীন্দ্রনাথের সময় লেগেছিল (আধ ঘণ্টা/ পঁয়তাল্লিশ মিনিট/ পনেরো মিনিট)।

২. ঘটে-যাওয়া ঘটনার ক্রম অনুযায়ী নীচের এলোমেলো ঘটনাগুলি সাজিয়ে লেখো :

২.১ কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এল- 'ও.কে।'

২.২ কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন।

২.৩ ২৫ বৈশাখের সন্ধ্যায় জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করবেন।

২.৪ প্রস্তুতির সময়ে নরম মখমল বসানো চেয়ারে বসে কয়েকবার ডাকলুম, হ্যালো ক্যালকাটা...হ্যালো.... ?

২.৫ সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটানো হলো কদিন ধরে।

২.৬ বেতার কর্তৃপক্ষ কবির কণ্ঠস্বরটি ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করবেন, তাই এই ব্যবস্থা।

২.৭ কবির জন্মদিনের কবিতাপাঠের জন্য কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত হলো।

৩. নীচের বাক্যগুলিতে দাগ-দেওয়া শব্দগুলোর অনুরূপ শব্দ পাঠ্য অংশটিতে পাবে। উপযুক্ত শব্দ খুঁজে নিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো :

৩.১ শরৎচন্দ্র দাসের ভ্রমণের বিবরণ থেকেই প্রথম তিব্বতের কথা জানা যায়।

৩.২ এই পথে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি তিব্বতে গিয়েছিলেন।

৩.৩ সবার অগোচরে আত্মগোপনের জন্য অন্যরকম পোশাক পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র একদিন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

৩.৪ ভুল মানুষমাত্রেরই হতে পারে, তবে নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ার সাহসও থাকা উচিত।

৩.৫ যাদের ওপর পরিচালনার ভার, এ-কাজের জন্য আগে তাদের দাবি-ত্যাগের প্রমাণপত্র প্রয়োজন।

৩.৬ যাঁরা নিজের নামেই বিখ্যাত, ভারতের সেই বরণীয় মানুষদেরই সম্মাননার আয়োজন হয়েছে এই সভায়।

৪. নীচের বাক্যগুলিতে যে ইংরেজি শব্দগুলি আছে, তার বদলে বাংলা শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো : (বাংলা শব্দের জন্য পাশের শব্দঝুড়ির সাহায্য নিতে পারো)

৪.১ ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সারা হলো।

৪.২ অত বড়ো এপিক পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যে নেই।

৪.৩ কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না।

৪.৪ বেতার-কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন।

৪.৫ ভোরে আমার ড্রাইভার এল গাড়ি নিয়ে।

৪.৬ একটা বুঝি বেল বাজল।

৪.৭ গির্জাটা হলো কালিম্পঙের ল্যান্ডমার্ক।

পথনির্দেশক চিহ্ন, সম্প্রচার, ঘণ্টা, মহাকাব্য, দূরভাষ, খাবারঘর, গাড়িচালক।

৫. নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :
মেঘময়, ভীষণ, মায়াচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম, দীপ্ত, অগম্য, বিপুল, ঝুপসি

৬. নীচের বিশেষ্যগুলির আগে উপযুক্ত বিশেষণ বসিয়ে বাক্য রচনা করো :
কণ্ঠস্বর, স্বপ্নলোক, ব্যক্তিত্ব, আশঙ্কা, ইতিবৃত্ত, কীর্তি, রেখাচিত্র, দিগ্বলয়

৭. নীচের দাগ-দেওয়া শব্দগুলি কী জাতীয়? শব্দগুলির বিশিষ্টতা উল্লেখ করে শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :

৭.১ শীতের হাওয়া ছিল কনকনে।

৭.২ ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

৭.৩ পায়ের নীচে কালিম্পঙ থরথর করতে লাগল কিনা আর মনে রইল না।

৮. নীচের বাক্যগুলি থেকে তারতম্যসূচক শব্দগুলি খুঁজে বার করো। কোনটি দুয়ের মধ্যে তুলনা, আর কোনটি বহুর মধ্যে তুলনা, তা নির্দেশ করে শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য রচনা করো :

৮.১ পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি।

৮.২ এর চেয়ে মহত্তর উদ্যোগ আর দেখিনি।

৮.৩ বাংলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮.৪ পাশের গলিটি সংকীর্ণতর হয়ে এসেছে।

৮.৫ অল্প আয়োজনে শুরু হলো দীর্ঘতম যাত্রা।

৯. নীচের বাক্যগুলি থেকে সংখ্যাবাচক শব্দ, অনির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ আর পূরণবাচক শব্দগুলি খুঁজে বার করে লেখো:

৯.১ গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসংকট হলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল।

৯.২ তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন।

৯.৩ দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়।

৯.৪ শরৎচন্দ্র দাস গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ ভাগে।

৯.৫ অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুত্র তিব্বতে যান।

৯.৬ বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘন্টা, সেই গতিতে গেলে লাসা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

৯.৭ একটু আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগল।

৯.৮ মনে পড়ে সেই ২৫ বৈশাখের অপরাহ্ণ।

৯.৯ যেখানে বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রি বাস করে গিয়েছিলাম।

৯.১০ কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন।

১০. নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে বদলে লেখো :

প্রণাম, অনুরোধ, পৃথিবী, উদ্বোধন, পূজা, উদ্বেগ, পুলক, আশঙ্কা

১১. নীচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে বদলে লেখো :

বৈদান্তিক, নবরচিত, অভিজাত, উচ্ছ্বসিত, প্রসিদ্ধ, প্রচলিত, প্রচুর, প্রধান

১২. নীচের শব্দগুলির সন্ধি ভেঙে লেখো :

শশাঙ্ক, হিমালয়, সর্বাপেক্ষা, অন্যান্য, রক্তিমাভা, যুগান্তর, মায়াচ্ছন্ন, অপরাহ্ণ, সর্বাধিক, রথীন্দ্র, নৃপেন্দ্র, স্বীকারোক্তি, শয়ান, সম্বর্ধনা, উন্নতি, অপরিচ্ছন্ন, দিগ্বলয়, বারম্বার, উদ্বোধন, উচ্ছ্বসিত

১৩. নীচের প্রতিটি শব্দের মধ্যেই দুটি করে শব্দ আছে, বুঝে নিয়ে ভেঙে লেখো :

জগৎপ্রসিদ্ধ, গিরিসংকট, কুলগুরু, ঠাকুরবাড়ি, ভ্রমণবৃত্তান্ত, রাজপুত্র, ছদ্মবেশ, কুঠিবাড়ি, অর্থব্যয়, নবরচিত, মহাকবি, ভারতবরেণ্য, স্বনামখ্যাত, স্বপ্নলোক, জন্মদিন

১৪. নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

১৪.১ তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ত্ব নামে পূজা করে।

১৪.২ তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে।

১৪.৩ কবি তাঁর ঘরের আসনে বসে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন ।

১৪.৪ কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

১৪.৫ শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন।

১৫. একটি বাক্যে উত্তর দাও:

১৫.১ প্রাচীন পথ ধরে কোন তিনজন প্রসিদ্ধ বাঙালি অতীতে তিব্বতে গিয়েছিলেন?

১৫.২ কোন প্রাচীন পথের রেখা ধরে তাঁরা গিয়েছিলেন?

১৫.৩ এখনকার পর্যটকরা এই প্রাচীন পথটি পরিহার করেন কেন?

১৫.৪ কোন দুই বিখ্যাত বাঙালি তিব্বতে গিয়ে বোধিসত্ত্ব উপাধি লাভ করেছিলেন?

১৫.৫ ছদ্মবেশে কে গিয়েছিলেন তিব্বতে?

১৫.৬ স্যার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল তিব্বত-বিষয়ক কোন বইটি?

১৫.৭ কালিম্পঙের কোথায় পড়াশুনো করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইংরেজ অনাথ ছেলেমেয়েরা ?

১৫.৮ গৌরীপুর প্রাসাদে কারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী?

১৫.৯ লেখকের অনুরোধে কোন পত্রিকার জন্য অনেকবার লেখা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

১৫.১০ ২৫ বৈশাখের সেই বিশেষ দিনটি যে ছিল শুক্লপক্ষ, লেখা থেকে সেকথা জানতে পারো কেমন করে?

১৬. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও:

১৬.১ কীভাবে গেলে পৌঁছনো যায় কালিম্পঙের গ্রেহামস হোম-এ? এই হোমটির বিশিষ্টতা কী?

১৬.২ ২৫ বৈশাখের ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রথম পাতায় শিল্পীর আঁকা যে বিশেষ রেখাচিত্রটি প্রকাশ পেয়েছিল, তার বিষয় কী ছিল? রবীন্দ্র-জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে ছবির এই বিষয়টি তোমার যথার্থ মনে হয় কিনা, লেখো।

১৬.৩ ‘কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে’— কোন কাজটি সম্পন্ন করবার ইচ্ছে লেখককে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? কেন সে-কাজ করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর? কার সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন ওই কাজে?

১৬.৪ ‘এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?’— কোন প্রসঙ্গে এই পরিহাস রবীন্দ্রনাথের?

১৬.৫ ‘কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।’ ‘বাগে পেয়েছিলেন’— এই বিশিষ্ট ক্রিয়াপদটির অর্থ কী? তাঁকে কবির ‘বাগে পাওয়া’র কী পরিচয় রয়েছে লেখকের সেদিনের বিবরণে?

১৬.৬ ‘কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উদ্বোধন’— কোন বিশেষ উপলক্ষে, কীভাবে এই উদ্বোধন সম্পন্ন হলো?

১৬.৭ ‘কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হলো’— নৃপেন্দ্রবাবু কে? কী ছিল তাঁর ফরমাশ? কীভাবে তা শুনেছিলেন লেখক?

১৬.৮ জন্মদিনে কবির স্বকণ্ঠে বেতার-সম্প্রচারিত কবিতা শোনাবার মুহূর্তটি কীভাবে ধরা দিয়েছিল তাঁর শ্রোতাদের চেতনায়?

১৭. দশটি বাক্যের মধ্যে উত্তর দাও :

১৭.১ এ-লেখায় একটা হারিয়ে-যাওয়া সময়ের ছবি আছে, ভারতবর্ষ তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন সন্তানের কথা আছে,যাঁদের সঙ্গে একসময় তিব্বতের নিবিড় যোগ রচিত হয়েছিল। লেখাটি অনুসরণ করে বাংলার ওই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয়েছে, নিজের ভাষায় লেখো।

১৭.২ এই লেখার একটি প্রধান চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি। কালিম্পঙ শহরে অতিবাহিত তাঁর একটি বিশেষ জন্মদিন উদ্‌যাপনের সম্পূর্ণ ছবিটি যেভাবে এখানে ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দাও।

১৭.৩ ইতিহাস-ভূগোলের ইতিবৃত্তে জড়ানো কালিম্পঙ নামে একটা শহরকে নতুন করে চিনতে তোমার কেমন লাগল, একটা অনুচ্ছেদে তা লেখো।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫—১৯৮৩) : বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ভ্রমণকাহিনি রচয়িতা। ‘কল্লোল’ পত্রিকার লেখকদের অন্যতম। প্রথম উপন্যাস ‘যাযাবর’। ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ নামে বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি লিখে প্রবোধকুমার বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন; এই গ্রন্থেই ভ্রমণ এবং উপন্যাসের একটি মিশ্র রূপ সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ‘চেনা ও জানা’, ‘নিশিপদ্ম’, ‘তুচ্ছ’ প্রভৃতি ছোটোগল্প সংকলন, এবং ‘প্রিয়বান্ধবী’, ‘নদ ও নদী’, ‘বনহংসী’ প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীর নাম ‘বনস্পতির বৈঠক’।

‘দেবতাত্মা হিমালয়’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) তাঁর ভ্রামণিক সত্তার একটি উজ্জ্বল পরিচয়। পাঠ্য অংশটি ‘দেবতাত্মা হিমালয়’-এর প্রথম খণ্ডের ‘কালিম্পঙ’ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

বই-টই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাই তো কাটি ছড়া,
বই পড়া সব মিছে-ই যদি
না হল টই পড়া।

টই পড়া যায় পড়তে কোথায়?
বলছি তবে শোনো,
বই-এর মাঝে লুকিয়ে থাকে
টই সে কোনো কোনো।

আর পাবে টই সকালবেলা
বই থেকে মুখ তুলে,
হঠাৎ যদি বাইরে চেয়ে
মনটা ওঠে দুলে।

টই থাকে সব রোদ-মাখানো
গাছের ডালে পাতায়,
টই থাকে সেই আকাশ-ছোঁয়া
খোলা মাঠের খাতায়।

টই চমকায় বিজলি হয়ে
আঁধার-করা মেঘে,
খই হয়ে টই ফোটে দিঘির
জলে বৃষ্টি লেগে।

টই কাঁপে সব ছোট্ট পাখির
রং-বেরঙের পাখায়,
খোকা-খুকুর মুখে আবার
মিষ্টি হাসি মাখায়।

বই পড়ো খুব যত পারো
সঙ্গে পড়ো টই,
টই নইলে থাকত কোথায়
এত রকম বই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি-লেখক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথমা’। অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘সম্রাট’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘সাগর থেকে ফেরা’। উপন্যাস—‘পাঁক’, ‘প্রতিশোধ’, ‘আগামীকাল’ ইত্যাদি। ‘ঘনাদা’ চরিত্রের স্রষ্টা। বহু ছোটোগল্প লিখেছেন।

বই পড়ার কায়দা কানুন

তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে যেতে পাপাই এসেছিল লাইব্রেরিতে আগের দিনের আদ্ধেক পড়া বইটা পড়বে বলে। রোজই লাইব্রেরিতে এসে নানারকম বই পড়তে তার খুব ভালো লাগে। কিন্তু পাপাই আজ খুব মুস্কিলে পড়েছে। কেননা আগের দিনের আদ্ধেক পড়া বইটা কিছুতেই সে খুঁজে পাচ্ছেনা।

লাইব্রেরিয়ান কাকু পাপাইকে বইটার নাম, বইটা কার লেখা অর্থাৎ বইটার লেখক কে জানতে চাইলে পাপাই তা বলতে পারেনি। কিন্তু বইটাতে যে চাকা, আগুন ইত্যাদি আবিষ্কারের গল্প ছিল অর্থাৎ বইটা কী নিয়ে লেখা তা মোটামুটি বলতে পেরেছিল। এইটুকু জেনেই লাইব্রেরিয়ান কাকু পাপাইকে বইটা খুঁজে দিলেন। লাইব্রেরিতে এত বইএর মাঝেও ঠিক বইটা খুঁজে পাওয়ার রহস্যটা যে বইটার নাম, লেখকের নাম অথবা বিষয়টা জানা আর কার পরে কোন বিষয় রাখা হয় আর কেনই বা রাখা হয় তার গল্পটা পাপাইকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে পাপাই আর লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুঁজে পেতে কখনো মুশকিলে পড়েনি। তোমারও শুনে নাও গল্পটা, তাহলে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পেতে অসুবিধা হবে না।

অনেকদিন আগে যখন মানুষ একা একাই গুহায় বাস করত, বনে বনে ফলমূল খেয়ে থাকতো তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসতো। যেমন ধরো রোজ সকালে আকাশে সূর্যকে দেখে সে ভাবতো এটা কী, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় যে বিষয় তৈরি হলো তার নাম **দর্শন**, বিদ্যুৎ চমকানো, বাজ পড়া, প্রবল বৃষ্টি, প্রকৃতির এইসব ঘটনায় মানুষের মনে ভয় থেকে জন্ম নিল অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা। এই ধারণা থেকে যে বোধ সৃষ্টি হলো তা মানুষকে সুন্দর জীবন আচরণ করতেও শেখাল, আমাদের ধারণ করল। তাই এই নিয়ে গড়ে ওঠা বিষয়ের নাম **ধর্ম**।

অনেক পরে একলা মানুষ গুহা ছেড়ে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে সহযোগিতা করে বাঁচার জন্য সমাজ তৈরি করল। সমাজের নানা দিক নিয়ে যে জ্ঞান তার নাম হলো **সমাজবিদ্যা**। সমাজ পরিচালনার নীতি নিয়ম, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-কানুন এই সবের চর্চা থেকে এল রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন ইত্যাদি বিষয়। সমাজ তৈরির পর সমাজে থাকতে গেলে প্রথমেই দরকার হলো আমার মনের ভাব অন্যকে বোঝানো এবং অন্যেরা কী বলতে চায় তা বোঝা অর্থাৎ ভাষার। তাই পরের বিষয় **ভাষা**।

প্রতিদিনের জীবনে তখন মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হতো। মানুষ তাঁর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটু একটু করে জেনে ফেলল তার চারপাশের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার পেছনে আসল কারণগুলো কী কী, অর্থাৎ শিখল **বিজ্ঞান** নামের বিষয়টি। বিজ্ঞানের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন অঙ্ক বা গণিত, মহাকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ শিখে ফেলল চাষবাস, আবিষ্কার করল নানারকম যন্ত্রপাতি। জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠল। জ্ঞানের এই দিকের নাম দেওয়া হলো **প্রযুক্তি**।

মানুষের মাথার মধ্যে তিনটে ঘর আছে। একটা ঘরে বাস করে যুক্তি আর বুদ্ধি, দ্বিতীয় ঘরে বাস করে কল্পনা আর তৃতীয় ঘরে বাস করে স্মৃতি। মানুষের যাবতীয় কাজ পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করে এই যুক্তি, কল্পনা আর স্মৃতি। দর্শন থেকে প্রযুক্তি পর্যন্ত যে যে বিষয়গুলো আমরা পেলাম তার পেছনে আছে যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ। এই বিষয়গুলো জানার ফলে মানুষ বাঁচার জন্য যা লাগে যেমন খাদ্য, পোশাক আর বাড়িঘরের ব্যবস্থা করতে পারল।

এর পরেও তারা থেমে থাকল না। কল্পনাশক্তি দিয়ে ছবি আঁকল, মূর্তি তৈরি করল, গান গাইল, নাটক করল, খেলাধূলা নিয়ে মেতে উঠল। সৃষ্টি হল বিষয় **শিল্প**। আর যখন সে লিখতে শিখল, সৃষ্টি হলো কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধের। সব মিলিয়ে বলা হলো **সাহিত্য**।

এই সব সৃষ্টিকে ধরে রাখল স্মৃতি। স্মৃতিঘরের নিয়ন্ত্রণে তিনটি বিষয় পাওয়া গেল — **ইতিহাস, ভূগোল আর জীবনী।**

১৮৭৬ সালে মেলভিল ডিউই নামের আমেরিকার একজন গণিতজ্ঞ ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী ০ থেকে ৯ দশমিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে একএকটা বিষয় চিহ্নিত করে সব বিষয়ের বইকে লাইব্রেরিতে সাজানোর জন্য একটা উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তৈরি তালিকাটি একবার মনে রেখে গল্পের সঙ্গে আর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

১০০ - দর্শন
২০০ - ধর্ম
৩০০ - সমাজ
৪০০ - ভাষা
৫০০ - বিজ্ঞান
৬০০ - প্রযুক্তি
৭০০ - শিল্প
৮০০ - সাহিত্য
৯০০ - ইতিহাস, ভূগোল আর জীবনী
০০০ - সাধারণ বিষয় যেমন অভিধান বিশ্বকোষ, খবরের কাগজ ইত্যাদি।
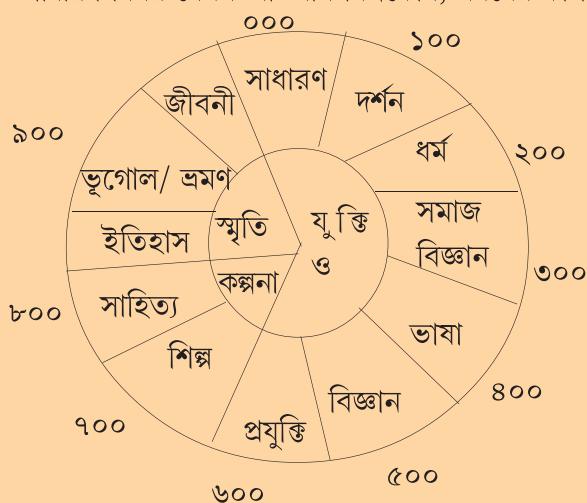
তবে সব লাইব্রেরিতেই যে বই এভাবে রাখা হয় তা নয়। কোথাও কোথাও লেখকের নাম ধরে বা অন্যভাবেও বই সাজানো থাকে। তাই লেখকের নাম বা বইটার নাম বা আখ্যা জেনে রাখা ভালো। নিজের স্কুলের বা পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে নাও কেমন করে সাজানো থাকে বইগুলো। আর ভালো করে দেখো বইয়ের নানা অংশ, যেমন আখ্যাপত্র, সূচিপত্র ইত্যাদি। তা হলে বই পড়া আর লাইব্রেরির ব্যবহার করা অনেক সহজ হবে।

বই পড়ার ডায়েরি

বইয়ের নাম	বই পড়ার তারিখ	বিষয় বা ধরন	কীভাবে পেলে	তোমার মতামত
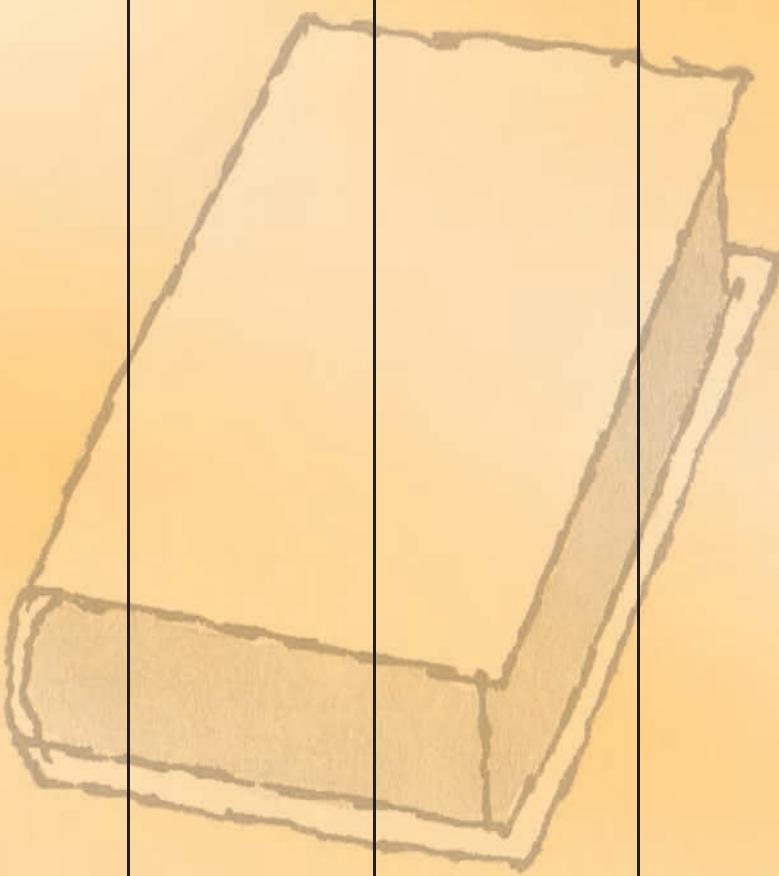
- বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তক সপ্তম শ্রেণি-বাংলা (সাহিত্য মেলা) রূপায়িত হলো। পড়ানোর আগে পুরো বইটি যত্ন নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ে নেবেন।

- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান'। নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে তুলে ধরা হয়েছে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, আর তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানবমনের বহুমাত্রিক কল্পনা। শিক্ষার্থীরা এই বইয়ে পড়বে কল্পবিজ্ঞানের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গদ্য ও কবিতা, শিল্পী ও চিত্রকরের আত্মকথা, ছবি আঁকার গল্প, গানের গল্প, জাদু কাহিনি, খেলার গল্প, প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে অনূদিত কবিতা ও গল্প, চিঠি, মজার নাটক, প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবী চরিতকথা। এছাড়াও বিভিন্ন লেখার সঙ্গে 'মিলিয়ে পড়ো' অংশ তো রইলই। মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, তা একটি বিশেষ অভিমুখে গতিময় ঝোঁক। কিশোর মনের স্বাধীনতাকে সেই প্রকল্প ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত করে নতুন কল্পনা আর শিখনের জগৎ। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোলায়, ভাবায়, আলোড়িত করে। এভাবেই কিশোর মন বইয়ের মধ্যে খুঁজে পায় নিজের ভাবনা ও কল্পনার খোরাক। তাই বইটিকে কাজে লাগিয়ে বদলাতে হবে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের বহু ধরনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে সে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারে।

- শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিশেষভাবে দেখতে হবে,সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় নির্ভুলভাবে কোনো বিষয়ে তার বক্তব্য লিখতে পারছে কিনা। সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। যেকোনো পাঠের ক্ষেত্রেই, সে গদ্যই হোক বা কবিতা, শিক্ষার্থী যেন সেই পাঠকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো মৌলিক ভাবনা বলতে এবং যুক্তি দিয়ে লিখতে শেখে। ধাপে ধাপে তাকে পাঠ্যবস্তুটি সম্পর্কে যেমন বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করতে হবে, পাশাপাশি সেই পাঠ্য প্রসঙ্গের অনুষঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে যেন সে চিন্তা করতে শেখে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। নীচের রেখাচিত্রটি সেকথা মনেরেখেই তৈরি করা হয়েছে।
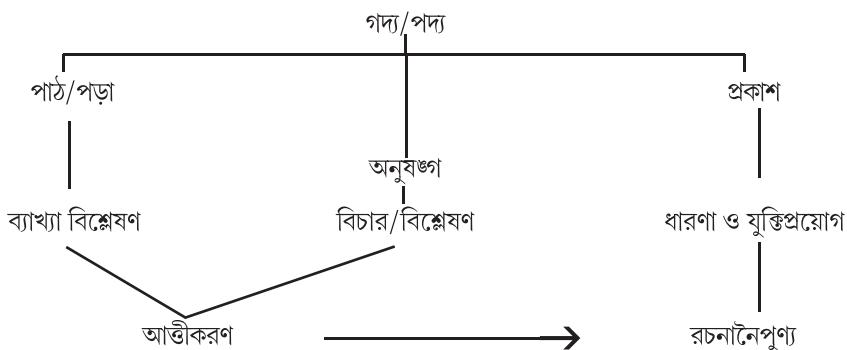
- দলগত এবং একক পাঠ উভয় বিষয় উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। নানা পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। 'হাতে-কলমে' অংশটিকে রূপরেখা হিসেবে ধরে এগোতে হবে।

- 'হাতে-কলমে' বিভাগের 'মিলিয়ে পড়ো' অংশে কিছু আছে কিনা দেখে নিন। কেননা ওখানে দেওয়া আর একটি ছড়া বা কবিতা বা গল্প তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেওয়া নয়, বরং তা লেখকের বিষয়গত দৃষ্টিকোণটিকে আর একটু প্রসারিত করে, বা নতুন কোনো মজার ভাবনা মেলে ধরে, যা হয়তো শিক্ষার্থীর মনের একটু কাছাকছি। এই অংশটিকে আপনি মূল পাঠ্যের মাঝে বা শেষে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারেন।

- এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে আপনি কবিতা কিংবা গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়গ্রাহী করার জন্য ব্যাখ্যায় উৎসাহিত করুন। এক্ষেত্রে দলগত বখ্যা থেকে আমরা ব্যক্তিগত মতামতের দিকে যাবো। শিক্ষার্থীরা এই আলোচনায় আনন্দ পাবে, আপনিও এই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে তার একঘেয়েমি কেটে যাবে, নতুন করে পাঠে তার মনোযোগ ফিরে আসবে। তখন আবার পাঠ্যের পরবর্তী অংশে ফিরে আসুন এবং অগ্রসর হন।
- 'মিলিয়ে পড়ো' অংশ যদি না থাকে, সবক্ষেত্রে নেইও, সেক্ষেত্রে 'হাতে-কলমে' বিভাগটি দেখবেন সেখানে চিঠি লেখা,গল্প সম্পূর্ণ করা, কিংবা ছোটো অনুচ্ছেদ লেখা ইত্যাদি কাজগুলি ব্যবহার করুন এবং আগের শ্রেণিতে শিখে আসা দিনলিপি লেখা, সংলাপ, ছবি দেখে লেখা, মানস মানচিত্র তৈরি করা প্রভৃতি কাজগুলিকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনুন। এক্ষেত্রে আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে নানারকম Open ended task -এ জড়িয়ে নিয়ে তাকে মুক্ত চিন্তার সুযোগ দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্যকারীর ভূমিকায় থেকে মনে মনে ভেবে লিখতে উৎসাহ দেবেন।
- এই শ্রেণি থেকেই সুযোগ থাকলে কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো দলকে প্রজেক্ট তৈরি করতে উৎসাহ দিন। যেমন ভাস্কর্য থেকে মাটির কাজ বা কোনো একটি সাংস্কৃতিক দিককে নিয়ে স্থানীয় সাংস্কৃতিক বিশেষত্বগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রজেক্ট করা যেতে পারে।
- আশা করি আমরা কীভাবে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছি তা স্পষ্ট করা গেছে। পাঠের সঙ্গে শিশুর নিরবচ্ছিন্ন যোগ তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই পাঠ চলাকালীন যেকোনো সময় 'হাতে-কলমে'র যে কোনো অংশ আমরা কাজে লাগাবো বিশ্লেষণে, নির্মাণে পুরোটাই শিশুকে সক্রিয়তায় জড়িয়ে রেখে। এই ভাবে 'পাঠ' আর 'হাতে-কলমে' অংশ একসঙ্গে শেষ করা যাবে।
- এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক ভাবে বজায় রাখলে শিশুর মনে সাহিত্যের রসাস্বাদন করার ক্ষমতা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি তাকে বুঝে প্রকাশ করার ক্ষমতাও গড়ে উঠবে। শিশুরা তাদের আঁকা ছবি ও খাতায় লেখা দিনলিপি ও চিঠি সাজিয়ে নিজেরাই তৈরি করতে পারবে নিজেদের দেওয়াল পত্রিকা। আপনি শুধু ওদের সঙ্গে থাকুন।
- এছাড়া আপনি 'হাতে-কলমে'র লেখক-পরিচিতি অংশ নিয়ে কাজ করার সময় সেই লেখকের অন্য কোনো লেখা তাদের পড়ে শোনাতে, গ্রন্থাগারে যেতে ও আরও পড়তে তাদের উৎসাহিত করবেন। গ্রন্থাগার না থাকলে নিজেই বই এনে তাদের পড়ে শোনান। পাঠ্য বইয়ের 'বই-পড়ো' রচনাটির সঙ্গে প্রদত্ত তালিকাটি অবশ্যই পূরণ করতে বলুন।
- এবার আসি ব্যাকরণের কথায়। নতুন পাঠক্রমে ব্যাকরণের বিষয়টি তার সুস্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে আরম্ভ হচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ... এই ভাবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তার যাত্রা। এই বছর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন বই চালু হলেও চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে তা হচ্ছে না। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্কে গ্রথিত এই বিন্যাসে চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির অংশটিকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে পঞ্চম বা সপ্তম শ্রেণির সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ব্যাকরণ রাখা যেতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে। তাই সপ্তম শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যাকরণের পুরোনো পাঠ্যসূচি অনুসৃত হবে।
- তবে উপরের এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নতুন বইয়ের 'হাতে-কলমে' অংশে ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চায় নতুন ও পুরোনোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান বইটিতে ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে রয়েছে বানান-বিধি সম্পর্কে পরিচিতি, এছাড়াও বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া, বচন, সন্ধি, কারক ও অকারক, প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ, নির্দেশক ও অনির্দেশক শব্দ, সমার্থক ও প্রায় সমার্থক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি, বিপরীতার্থক শব্দ, ক্রিয়ার কাল নির্ণয়, বাক্যের সাধারণ গঠন, উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারক, শব্দ ভাণ্ডার, প্রচলিত শব্দের আদি ও পরিবর্তিত অর্থ প্রভৃতি জরুরি প্রসঙ্গগুলি এসেছে। এছাড়া জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশ্নের সম্ভার সমগ্র বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সবসময় পাঠ্যকেন্দ্রিক প্রশ্ন থেকে ধীরে ধীরে পাঠ্যবই অতিক্রমকারী মৌলিক ধারণা প্রকাশের সুযোগ আছে এমন Learning task -এর দিকে এগিয়ে চলুন।
- পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থবিদ্যা চর্চা কোনোক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়। পাঠ্য পুস্তক পরিকল্পনায় এবং তার অনুশীলনীতে সেই প্রথাবদ্ধ ধরনকে বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।
- হাতে-কলমে অংশটিকে বিশেষ গুরুত্ব এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষার্থী একতরফা শুনে যাওয়ার পরিবর্তে সক্রিয়তার মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শেখে।
- শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রতিটি পাঠ্যাংশ পড়ানোর ক্ষেত্রে বা হাতেকলমে চর্চার প্রসঙ্গে যে কোনো ধরনের উজ্জীবনী তথা উদ্ভাবনী অংশ সংযোজন করতে পারেন।
- পাঠ্যসূচিতে থাকা গানগুলি শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেয়ে শোনাবেন, এছাড়া কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যও নিতে

পারেন। শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। এই গানগুলি বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়, সেখানে ব্যবহার করবেন। গানকে গান হিসেবেই ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রাখবেন। কবিতা হিসেবে নয়। পারলে এইধরনের আরও গান শোনান ও শেখান।

- বইটি পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের প্রধান নজর থাকবে শিক্ষার্থীর শিখনস্তরের দিকে। প্রয়োজনে তিনি পূর্বপাঠের পুনরালোচনা বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ পাঠ-পরিকল্পনার কথাও ভাবতে পারেন।
- সমগ্র পুস্তকটিই পাঠ্য। অংশবিশেষ পাঠ্য নয়। পাঠদানের ধারাবাহিক গতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু তা কখনোই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর কথা ভুলে গিয়ে নয়।
- শিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

* 'মাকু' বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। মোট এগারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি পিরিয়ড নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিমাসে একটি করে অধ্যায় শেষ করবেন। শেষ দুটি অধ্যায় (দশম ও একাদশ) একত্রে পড়ানো সম্ভব। এইভাবে মোট দশটি মাসে পাঠ্যটিকে ভাগ করে নিয়ে পড়াতে পারেন। বইটির পরিশিষ্ট 'হাতে-কলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকলো। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন-নতুন প্রশ্ন ও অন্যান্য কৃত্যালি উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম পাঠ এবং বই পড়ার কায়দা কানুন*	ছন্দ ও সুর সম্পর্কে ধারণা লাভ ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা।
ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয় পাঠ	মাতৃভাষা ও স্বদেশ চেতনা।
মার্চ	তৃতীয় পাঠ	ছবি, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ। এই বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দান।
এপ্রিল	চতুর্থ পাঠ	বিজ্ঞানমনস্কতা ও মনুষ্যত্ব।
মে	পঞ্চম পাঠ	বাংলা গানের কারিগর বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের গানের নেপথ্যের গল্প জানা গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দান। বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা অন্যান্য গীতিকারদের জন্মদিন পালন।
জুন জুলাই	ষষ্ঠও সপ্তম পাঠ	বর্ষার গানের চর্চা। রজনীকান্তের গান সম্পর্কে ধারণা।
আগস্ট সেপ্টেম্বর	অষ্টম ও নবম পাঠ	দেশের কথা ও দেশাত্মবোধক গানের চর্চা। খেলা ও খেলার সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা। লোকসংগীত সম্পর্কে ধারণা।
অক্টোবর নভেম্বর	দশম পাঠ একাদশ পাঠ	নাটকটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ে উৎসাহ দিন।

* দুমাস অন্তর বইপড়া নিয়ে কথা বলুন। প্রত্যেকের 'বইপড়ার ডায়েরি' অংশটি দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।